বিবাগী পাখি

মেয়েটার বয়েস বছর চোদ্দ-পনেরোর কম নয়, কিন্তু খাটো স্কার্ট আর আঁটো জ্যাকেটের কারসাজিতে অধিকারী তাকে 'দশে' নামিয়েছে।

তবু যেটুকু সন্দেহ আসতে পারত, সেটুকুও মেরে নেওয়া হয়েছে কোমরে ওই চওড়া জরির কোমরবন্ধটাকে কষে বেঁধে দিয়ে। ওটার জন্যেই বিশেষ করে বালিকা বালিকা লাগে। তা ছাড়া ভঙ্গিটাও লিলির নিতান্তই বালিকাসুলভ। যেন মনটাকেও সে ওই খাটো স্কার্ট, আঁটো জ্যাকেট আর চওড়া কোমরবন্ধের দেওয়ালের মধ্যে আটকে রেখেছে। পুরনো কালের চীনের মেয়েদের লোহার জুতোয় পা আটকে রাখার মতো।

অধিকারীকে সবাই 'অধিকারীমশাই' বললেও 'ভবানী অপেরা'র অধিকারী কুঞ্জলাল দাস সেই সম্বোধনটাকে খুব না-পছন্দ করে। বলে, 'মিস্টার দাস বললে কি হয়? কি হয়?'

হ্যাঁ, 'মিস্টার' শব্দটা বিশেষ পছন্দ কুঞ্জলালের। কারণ নিজেকে সে 'প্রোপ্রাইটার' বলে থাকে। তা বলবার অধিকার তার নেই তা নয়।

প্রোপ্রাইটার দাসের 'ভবানী অপেরা' শুধু মফস্বর শহরেই 'নাম' কিনে বেড়ায় না, কলকাতার যাত্রা প্রতিযোগিতার উৎসবে এসেও নাটক দেখিয়ে মেডেল নিয়ে যায়।

পৌরাণিক পালার দিকে মন নেই কুঞ্জর, সামাজিক নাটক নামায় সে। সমাজের সর্ববিধ অনাচার কদাচারকে লোকের সামনে তুলে ধরে তার ওপর চাবুক মেরে দেখাতে চায় কুঞ্জ, কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে সমাজ, কী পরিমাণ দুর্নীতিতে ডুবে যাচ্ছে দেশ?

তাই কুঞ্জর পালাগুলির নাম সাধারণত এই ধরনের হয়—'ভণ্ডামীর মুখোস', 'একেই কি বলে দেশসেবা?', 'দুঃখীর রক্ত', 'নিরন্নের কান্না', 'চাবুক', 'কষাঘাত' ইত্যাদি।

কুঞ্জ অধিকারী যে কতবড়ো বুকের-পাটাওয়ালা লোক একথা টের পাওয়া যায় ওই সব পালা দেখলে। রাজা-উজির থেকে শুরু করে, দারোগা, দেশ নেতা, কালোবাজারী বা অসতী নারী, সব্বাইকে এক তরোয়ালে কাটে কুঞ্জ, এক চাবুকে দাগে। কাউকে রেয়াত করে না।

শোনা যায় কোথায় নাকি কোন্ বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপে একখানা পালা নামিয়েছিল কুঞ্জ, যার নাম ছিল 'দুঃশাসন' এবং যার নায়ক ছিল এক পুলিশ ইনস্পেক্টর। সাদা বাংলায় দারোগাবাবু।

বলা বাহুল্য সে নাটকে দারোগাবাবুদের প্রীত হবার মতো উপকরণ ছিল না। আর ভাগ্যের খেলায় সেখানে দর্শকের আসনে এক দারোগাবাবু উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ওই উদ্যোক্তাদের কোনো মাননীয় আত্মীয়, আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।

'দুঃশাসন' নামটি শুনেই তিনি মহাভারতের পৃষ্ঠায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও ভয়ঙ্কর একটি 'রক্তপান উৎসব'-এর অপেক্ষায় স্পন্দিত হচ্ছিলেন। কিন্তু অভিনয় শুরু হতেই কেমন যেন চাঞ্চল্য অনুভব করতে থাকেন দারোগাবাবু, তারপর মাঝপথে হঠাৎ 'রে রে' করে তেড়ে ওঠেন। আর সেই 'রে রে' করার প্রতিক্রিয়ায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের অভাব প্রায় পূর্ণ হয়।

দারোগাবাবুর চিৎকার, সমবেত জনগণের প্রবল প্রতিবাদ, আর শিশুকুলের কান্না, সব মিলিয়ে সে একেবারে কেলেঙ্কারি চরম। দারোগাবাবু দাপিয়ে বেড়ান—'আমি ওই অধিকারী শা-কে অ্যারেস্ট করব, ওকে আমি ঘানি টানাব, ওকে ওর বাবার বিয়ে দেখাব, ওর 'যাত্রাপালা' করে বেড়ানো জন্মের

শোধ ঘোচাব', ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ একজন ক্ষমতামদমত্ত ব্যক্তির আগুন-জ্বলে-ওঠা মাথায় যা যা বলা সম্ভব সবই বলে চলেন। ওদিকে নাটক পণ্ড হওয়ায় অগণিত অসহিষ্ণু দর্শক হই-চই করতে থাকে।

কিন্তু সহসা এক নাটকীয় আবির্ভাব ঘটে।

বুক ভর্তি মেডেলে সুসজ্জিত গর্বদৃপ্ত প্রোপ্রাইটার কুঞ্জ দাস এসে কথার ভণিতায় একেবারে ঠাণ্ডা করে দেয়।

কুঞ্জ দাস এসে দাঁড়ায়, তার বুকের উপরকার মেডেলগুলো আলোয় ঝকমকিয়ে ওঠে, আর পিছন থেকে একটা লোক সেই আদ্যিকালের গ্রামোফোনের চোঙ একটা বাড়িয়ে ধরে কুঞ্জর মুখের কাছে।

কুঞ্জ তার ভিতর থেকে আবেদন জানায়, 'গরিবের মা-বাপ দারোগাসাহেব, অ্যারেস্টই করুন, আর ফাঁসিই দিন, কোনো আপত্তি নেই, দয়া করে শুধু আপনার সামনে একখানা প্রশ্ন নিবেদন করতে দিন।'

হঠাৎ এই বাজখাঁই নিবেদনে গোলমালটা উদ্দামতা হারায়, কৌতূহলী জনতা কান খাড়া করে সেই 'প্রশ্নখানি'-র আশায়। দারোগাবাবুও হঠাৎ একটু থিতিয়ে যান। আর 'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস'-এর চোঙ বলে চলে, 'অপরাধটা আমার কোথায় বলতে পারেন আজ্ঞে? মানছি আমার নাটকে একজন পাজী বদমাস ঘুষখোর দারোগার চরিত্র-চিত্রণ করা হয়েছে। যে লোকটা হাতে-পাওয়া ক্ষমতাবলে যত পারছে বেআইনী কাজের সাহায্য করে তার বিনিময়ে মোটা মোটা টাকা উৎকোচ নিচ্ছে। আছে আমার নাটকে এমন চরিত্র। কিন্তু বাবুমশায়, বলুন একবার, সেই লোক কি আপনি? আপনার চরিত্র কি এত নীচ? বলুন? বলুন, আমার 'দুঃশাসন'কে দেখে কি আপনার নিজের প্রতিবিম্ব বলে মনে হচ্ছে? তা যদি হয়, আমাকে এখুনি গুলি করুন, মানীলোকের মানের ক্ষতি করেছি, এই ভেবে কান মুলতে মুলতে মরব।

কিন্তু বাবুমশায়, আমার প্রশ্নখানার জবাব দিয়ে তবে গুলি করতে হবে। বলুন নাটকের এই চরিত্র আপনকার প্রতিবিম্ব বলে মনে হচ্ছে?

বক্তব্য এবং বক্তব্যের ভাষায় দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন ওঠে। আর দারোগাবাবুর মুখ লাল হয়ে ওঠে?

কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তনে ডাকহাঁকটা সামলাতে হয় তাঁকে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গাম্ভীর্য এনে বলেন তিনি, 'আমার কথা হচ্ছে না, কিন্তু এভাবে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরের গায়ে কালি ছিটানো মানেই পুলিশ জাতটাকে অপমান করা।' স্বজাতি প্রেমবিগলিত দারোগাবাবু কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তোলেন। বলেন, 'সেই অবমাননার অপরাধে তোমার নামে চার্জ আনব আমি।'

তথাপি কুঞ্জ দাস ভয়ে ভীত হয় না।

কুঞ্জ দাস আবার চোঙের পিছনে মুখ রাখে, আর চোঙের মুখে খন্‌খনে গলায় বলে চলে, 'চার্জ আপনি আমার নামে একটা কেন, একশোটা আনতে পারেন বাবুমশায়, আপনিই যখন ইনচার্জ, চার্জের ভাঁড়ারটাই তো আপনকার হাতে। কিন্তু তাহলেও আবার একখানা প্রশ্ন রাখতে হয় বাবুমশায়। প্রশ্নখানা হচ্ছে, অধম কুঞ্জ দাসকে চার্জে ফেলার আগে এ প্রমাণটা দিতে পারবেন কি 'সমগ্রো' পুলিশ বিভাগে কোথাও ঘুষ নেওয়া নেই, চোর বদমাসদের সাহায্য করা নেই, গাঁটকাটা, পকেটমারদের সহায়তা করা নেই?...জবাবটা স্যর দিতেই হবে।...তারপর আমি আছি, আপনি আছেন, আর আপনার চার্জ আছে।'

দারোগাবাবুর মাথার মধ্যে সমুদ্র-রোল। দারোগাবাবুর কানের মধ্যে হাসির কল-কল্লোল। এই ভণিতা, এই বাক্‌চাতুরী, এর সঙ্গে লড়তে পারবেন তিনি? পারতেন, শুধু 'দুজনে মুখোমুখি' হলে,

মাথার ঘিলু বার করে দিতেন অধিকারীর। কিন্তু এখানে সহস্র লোক। আর অন্তরলোকে অনুভব করতে পারেন, সেই সহস্রের ঊনসহস্রই অধিকারীর পক্ষে।

কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে থাকা চলে না? দারোগাবাবু তাই যথাসম্ভব গলা চড়িয়ে বলে ওঠেন, 'এক-আধটা বেচাল লোক সর্বত্রই থাকে অধিকারী, কাজেই তামা-তুলসী নিয়ে শপথ করতে পারিনে। তথাপি আমি নিশ্চয়ই আপত্তি তুলব, এভাবে যাত্রা-থিয়েটারের মধ্যে সেই একজনকে টেনে এনে 'ইয়ে' করা। কথা জোগায় না বলেই 'ইয়ে' দিয়ে সারেন দারোগাবাবু। তারপর চেঁচিয়ে বলেন, 'থানায় তোমায় যেতেই হবে।'

'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস'-এর চোঙ্ আবার খনখনিয়ে ওঠে, 'সে তো বুঝতেই পারছি স্যর! আপনকার যখন হুকুম। তবে এটাই বুঝছি না স্যর, আমার এই নাটকে এই যে একটা অতি কুচরিত্র মেয়েছেলের পার্ট রয়েছে, যে নাকি নিজের স্বামীকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করছে, কই তাকে দেখে তো এখানের এই শত শত মা-লক্ষ্মীদের মধ্যে কেউ আপনার মতো ক্ষেপে উঠলেন না? কই বলে উঠলেন না তো—'যেহেতু ও মেয়েছেলে, সেই হেতু আমাদের গায়ে অপমানের কালি এসে লেগেছে!' তবে সাধ্যমতো বলি—বলবেন কেন? ওনারা—আমাদের সতীসাধ্বী মা-জননীরা জানেন, নাটক-নবেলের কাজই এই! মন্দকে চোখে ধরিয়ে দেওয়া। পাপকে উচ্ছেদের চেষ্টা করা! ওনারা ওই বদ মেয়েছেলেটাকে মোটেই 'স্ব-জাতি' বলে মনে করছেন না। তাই ওনারা নীরবে নাট্যদৃশ্য দেখছেন! তা সে যাক—এখন বলুন বাবুমশায়, নাটক বন্ধ করে এই দণ্ডে আপনকার সঙ্গে থানায় যেতে হবে, না নাটকটা আজ্ঞে শেষ করে যাব? তবে পালিয়ে আমি যাব না। বলুন, এখন আপনার কী আদেশ?'

দর্শককুল এতক্ষণ যাত্রাপালার বদলে তর্জার লড়াইয়ের আস্বাদ অনুভব করে চুপ করে ছিল। এবার তুমুল হট্টগোল ওঠে, 'নাটক হোক! পালা চলুক!'

দারোগাবাবু এই উন্মত্ত গণদেবতার দিকে তাকান, তারপর 'আচ্ছা ঠিক আছে—' বলে গট গট করে বেরিয়ে যান।

তুমুল হর্ষোচ্ছ্বাসের মধ্যে আবার ভাঙা-পালা জোড়া লাগে। দর্শকরা হাততালি দিয়ে দিয়ে হাতে ব্যথা ধরিয়ে ফেলে।

বলাবাহুল্য পরে দারোগাবাবু তাকে 'দেখে নেবার' চেষ্টাই আর করেননি।

এই। এই বুকের পাটা আর বাক্‌চাতুরীর জোরেই কুঞ্জ দাস দলের লোকগুলোকে মুঠোয় পুরে রেখেছে। নচেৎ—জগতের যত 'শাসন-শোষণ-নিপীড়ন'-এর দৃশ্য তুলে তুলে সমাজের চৈতন্য করিয়ে দিতে আসে বলেই যে কুঞ্জ নিজে ওই দোষগুলির বাইরে, তা নয়। দলের লোকদের উপর কুঞ্জর ব্যবহার দারোগার বাবা-সদৃশ। তবে মারধর করে না সে।—কাউকেই না।

ওই লিলিটা তো সেই তিন চার বছর বয়েস থেকে অধিকারীর কবলে, বলুক দিকি মার কোনোদিন খেয়েছে? অধিকারীর শাসননীতি অন্য ধরনের। সে হাতে মারে না, ভাতে মারে। খেতে না দেওয়া হচ্ছে তার প্রধান শাসন। তাছাড়া—খাটানো। সেও এক রকম শাসন। যে যেদিন অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তার ওপর দলের সমস্ত লোকের রান্নার ভার পড়ে, কাঠ কাটা, জল তোলা, বাসন মাজার ভার পড়ে। বামুনের ছেলে হলেও রেয়াত নেই।

ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে কেউ প্রতিবাদ তুললে, কি গোঁজ হয়ে থাকলে, অধিকারী তার মিষ্টমধুর বচন ঝাড়ে।—

'বামুনের ছেলে? অ্যাঁ, কী বললি? বামুনের ছেলে? ওরে বাপধন, সেই দৈব ঘটনাটা এখনও মনে রেখেছিস? ভুলে যা বাপ ভুলে যা! মনে রাখলে শুধু যন্ত্রণা। ওরে তুই যে একদা বামুনের ঘরে জন্মেছিলি, সেটা সেরেফ দৈবাতের ঘটনা। মানুষের পেটে কখনও কখনও যেমন তে-পয়ে জীব

জন্মায়, একটা মাথা দুটো ধড়, আজব প্রাণী জন্মায়, তেমনি!...'বামুনের ছেলে! বাসন মাজব না—' শুনে হাসিতে যে পেট গুলিয়ে উঠছে রে! বলি—জাত তোর এখনও আছে? বামুনের ছেলের যা যা কত্তব্য করিস সব? ত্রিসন্ধে গায়ত্রী? স্বপাক হব্বিষ্যি? বল? বল বাপ!'

আশ্চর্য! তথাপি রাগ করে চলে যাওয়ার ঘটনা প্রোপ্রাইটার কুঞ্জ দাসের দলে বিরল ঘটনা! ওই বাক্য সুধা পানের পর অপরাধী ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিয়ে অধিকারীর নির্দেশিত কাজই করে। টিকেও যায়।

তবে শাস্তিস্বরূপ দৈবাৎ ভাত বন্ধ করলেও এমনিতে কুঞ্জর এখানে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা দস্তুরমতো ভালো! আর সে খাওয়ায় পক্ষপাতিত্ব নেই। অধিকারী নিজে যা খায়, শতরঞ্জি গুটোবার চাকর কেষ্ট বাগ্দীও তাই খায়।

ওই যে লিলি, যাকে না কি সবাই ব্যঙ্গ করে বলে থাকে, অধিকারীর 'পুষ্যিপুত্তুর', তারও ওই একই বরাদ্দ। ভালো আয়োজন হল তো 'ভালো', আর সুবিধে অসুবিধেয় আয়োজন খারাপ হলে 'খারাপ'।

আদুরে খুকি লিলি কোনো কোনো দিন আদুরে গলায় বলে, 'চচ্চড়ি আমি খাব না।' ডাল ভাত আমার বিচ্ছিরী লাগে, আমি শুধু মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাব।'

অধিকারী তার জোড়া বেণীর একটাকে টেনে তাকে কাছে নিয়ে এসে বলে, 'বুঝলাম, খাবে। ডালভাত তোমার রোচে না, তাই শুধু মাছের ঝোল ভাত খাবে। কিন্তু বলতো যাদু, কেন তা খাবে? কিসের দাবিতে? সবাই যা করছে, তুমি তাই করছ! মাঝে মাঝে পার্ট করছ, আর কি? আর কিছু নয়। তবে? ভাবছ যে অধিকারীর আদুরী আমি, আমার জোর বেশি, কেমন? ভুল! ভুল মাইডিয়ার, একেবারে ভুল! এই প্রোপ্রাইটার কুঞ্জ দাসের কাছে একচোখোমি পাবে না, সব সমান! তুমি এখনও পর্যন্ত চুল গুটিয়ে ছেলে সাজছ, তোমার দক্ষিণে কম। যখন চুল এলিয়ে হিরোয়িন সাজবে, তখন দক্ষিণে বাড়বে। ব্যস্!'

তবে মন ভালো থাকলে আর সময় থাকলে যখন পাকা চুল তুলতে ডাকে লিলিকে, তখন একটু প্রশ্রয় দেয়। চোখ বুজে বুজেই বলে, 'এবারে পুজোয় কি নিবি বল? আনারসী শাড়ি? ঘুন্টিদার জুতো? লাল রিবন? আচ্ছা আচ্ছা, হবে।'

আবার কোনো সময় গল্পও করে কুঞ্জ লিলির সঙ্গে। 'কেষ্টা হতভাগা কতবড়ো হতভাগা জানিস? সেদিন নাকি শতরঞ্জির ওপর কোন্ বাবু ভাইয়ের একখানা মানিব্যাগ পড়ে ছিল, ছোঁড়া নাকি সেটা বিপিন সরকারের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছে! দেখ তবে কতবড়ো মুখ্যু আর হতভাগা! নিয়ে নিতিস, কে দেখত শুনি?'

লিলি ঠিকরে উঠে বলে, 'ভগবান দেখত।'

'ভগবান! ও বাবা! সে লোকটা আবার দেখতে পায় নাকি? সে তো বোবা কালা অন্ধ রে!'

'কক্খনো না, ভগবান সব দেখে! এই যে তুমি সবাইকে এত কষ্ট দাও, ভগবান নিশ্চয় দেখতে পায়।'...আহ্লাদী! আহ্লাদী বলেই এতটা বলতে সাহস পায়।

তা এ রকম সময় কুঞ্জ দাস বিশেষ শাসন করে না। হয়তো শুধু বলে, 'পায়? দেখতে পায়? তবে তো তোকে কাল উপোস করিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিতে হয়।'

লিলি উত্তেজিত গলায় বলে, 'কেন? কেন শুনি? আমার সঙ্গে কি?'

অধিকারী মোলায়েম গলায় বলে, 'ভগবান তো দেখবে? দেখে আমার কি শাস্তি করে, সেটাই দেখতে চাই।'

লিলি রেগে বলে, 'শাস্তি কি আর এ জন্মে হয়? পরের জন্মে হবে শাস্তি।'

'পরের জন্মে?' অধিকারী হা হা করে হেসে উঠে বলে, 'তবে নির্ভয় রইলাম। পরের জন্মে তো

গরু গাধা ঘোড়া ছাগল এই রকমই একটা কিছু হবই, মনিবে পিটুনি দিয়ে দিয়ে খাটিয়ে নেবে, এ তো পড়েই আছে।'

লিলি গম্ভীরভাবে বলে, 'ভালো কাজ করলে আসছে জন্মে বামুন হতে পারতে তুমি।'

'বামুন? ওরে সর্বনাশ।' কুঞ্জ দাস কানে হাত দেয়, 'তা হলে তো কাজের ছায়া মাড়ানো বন্ধ করতে হয়।'

'বামুনের ওপর তোমার অ্যাতো রাগ কেন বল তো? অধিকারীর পাকা চুল তোলার শেষে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে, লিলি আদুরে গলায় বলে, 'সবাই বলে তুমি নাকি বামুন বেছে বেছে দলে নাও, আর তাদের ওপর অত্যাচার কর!'

'বলে বুঝি?' কুঞ্জ এবার গলা ছেড়ে হাসে। 'বলেছে তোর কাছে? বামুন ব্যাটাগুলো আচ্ছা ধূর্ত তো! ধরে ফলেছে সব!'

ওদিকে নিমাই, জগবন্ধু, সনাতন, বিপিন, ব্রজ, সবাই চোখ টেপাটেপি করে, 'কর্তার মেজাজ খুব শরিফ দেখছি! 'পুষ্যিপুত্তর' বুঝি পাকাচুল তুলতে গেছে?'

'এখনও খুকি করে রেখে দিয়েছে। ব্যাপার কি বল দিকি? ইচ্ছে করলেই তো একটা 'মেন' পার্ট দিতে পারে?'

'দেবে না। মতলব আছে ভেতরে ভেতরে।'

'কী মতলব বল দিকি?'

ব্রজ সবজান্তার ভঙ্গিতে বলে, 'বিয়ে দেবে। কন্যে দানের পুণ্যি কুড়োবে! এখন খুকি সেজে বেড়াচ্ছে, নয়তো নাটকে 'বালক' সাজছে, লোকের চোখে পড়ছে না। শাড়ি পরে নাটকে অবতরণ করলেই তো হয়ে গেল! সবাই চিনে ফেলবে। বিয়ের বারোটা বেজে যাবে।'

'বিয়ে দেবে?' নিমাই হি হি করে হাসে, 'দেবে তো আমার সঙ্গেই দিক না বাবা? দিব্যি সুন্দরী, ঢং ঢাংও জানে খুব।'

'তুই তো বামুন?'

'বামুন! হ্যাৎ!' নিমাই বলে, 'বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া। দেয় তো লুফে নিই।'

'দেবে না।' সনাতন বিচারকের রায়ের মতো অমোঘ ভঙ্গিতে বলে, 'তুই বামুন বলেই দেবে না।'

'আচ্ছা, কেন বল দিকি? বামুনের ওপর ওর এত জাতক্রোধ কেন?'

'জানিসনে বুঝি?' বিপিন ওরই মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, আর বিপিন সবচেয়ে পুরনো। তাই বিপিন জ্ঞান দেয় ওদের, 'ওর পরিবার যে ওদের দেশের এক বড়লোক বামুনের ছেলের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বলিনি তোদের এ কথা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলে বটে একদিন। কিন্তু সেটা কি সত্যি?'

'অসত্যির কী আছে? জগতের কোথাও কারুর বিয়ে-করা বৌ পর-পুরুষের সঙ্গে কুলের বার হয় না?'

'তা বলছি না! তবে—'

বিপিন বলে, 'আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক তো! ওর বিত্তান্ত আমিই বেশি জানি। বৌ পালিয়ে গেল, বছর পাঁচেকের একটা মা-মরা ভাগ্নে ছিল সেটা মরে গেল। ও তাই ঘটিবাটি তুলে গ্রাম ছেড়ে একটা যাত্রার দলে ঢুকল। 'মাধব অধিকারী'র যাত্রার নাম শুনেছিস? না, নামকরা খুব নয়, তবে ছিল তখন। সেইখানে ওর হাতেখড়ি। তা ও নাকি নিজে একখানা পালা লিখে নিয়ে গিয়েছিল—'নারী না নাগিনী?'। বলেছিল, সেইটা আসরে নামাতে। অধিকারী বলত, 'দেখব দেখব', দেখতে গা করত না। একদিন বলল, 'দেখেছি, অখাদ্য!' ব্যস হঠাৎ আমাদের কর্তা চটেমটে খুব বচসা

লাগিয়ে দিল, রাগের মাথায় খাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে, অধিকারীর মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে নিজে দল খোলবার তাল করে বেড়াতে লাগল। তারপর তো এই দেখছিস?

'তা পালা তো আর লেখে না কই নিজে?'

'না! বোধহয় বুঝেছে অখাদ্যই হয়েছিল।'

নিমাই মিটি-মিটি হেসে বলে, 'নারী না নাগিনী?' নিজের সেই লক্ষ্মীছাড়া বৌটার কাহিনি নয় তো?'

'হতে পারে।' বিপিন বলে, 'আমারও সে সন্দেহ ছিল। তবে বলিনি কোনোদিন কিছু। কি জানি মুখে মুখে ছড়িয়ে যদি দুর্বাশার কানে যায়। আমি যে ওর ইতিহাস জানি, ওর পাশের গাঁয়ের লোক, কিছুই বলিনি কোনোদিন। বললে কোপে পড়ে যাব কিনা কে জানে। ...এই আজ হঠাৎ তোদের কাছে বলে ফেললাম, দেখিস যেন পাঁচ কান না হয়।'

ওরা সবাই একযোগে হেসে ওঠে। বলে, 'পাঁচ কান? সে তো হয়েই বসে আছে। নিমাই, জগবন্ধু, সনাতন, ব্রজ আর বিপিনদা তুমি নিজে, পাঁচ দু'গুণে দশ কান!'

'আরে বাবা, অধিকারীর কানে না গেলেই হল—' বিপিন বলে, 'রাগলে দুর্বাসা'—'

এই রকম আলোচনার ক্ষেত্রে হঠাৎ লিলি এসে দাঁড়ায়। বেল্ট বাঁধা কোমরে একটা হাত দিয়ে মহারানীর ভঙ্গিতে বলে, 'কী হচ্ছে কি তোমাদের? কাজকর্ম নেই?'

বিপিন বিরক্ত গলায় বলে, 'আছে কি নেই তাতে তোর দরকার কিরে ছুঁড়ি? তুই নিজের চরকায় তেল দিগে না।'

'আমার চরকা?' লিলি হি হি করে হাসে। 'আমার চরকায় তো তেল দিয়ে এলাম এতক্ষণ ধরে? একশো তিনটে পাকা চুল তুলেছি।'

'আর, তুললি না কেন? মাথা বেল করে দিগে না?' বিপিন রেগে রেগে বলে।

লিলি কিন্তু রাগে না। সে ঘাগরা ঘুরিয়ে একটা পাক খেয়ে বলে, 'বলে দেব প্রোপ্রাইটার'কে।'

'দিগে যা, লাগানি-ভাঙানী-খোসামুদী!'

লিলি এবার রেগে ওঠে। বলে, 'দেখ বিপিনদা, ভালো হবে না বলছি! তোমরা এখানে আড্ডা দিচ্ছ, তোমাদের হাসিতে প্রোপ্রাইটার মশাইয়ের ঘরের ছাত ফাটছে। তাই আমাকে বলে দিল, যা তো লিলি, দেখে আয় তো বাছাধনেদের এত ফূর্তি কিসের? কাজকর্ম নেই? উচ্চ হাসির বান ডাকিয়েছেন একেবারে!'

ব্রজ এই 'পুষ্যিপুত্তুর'টিকে একেবারে দেখতে পারে না। তাই রুক্ষগলায় বলে, 'কেন? তোর প্রোপ্রাইটারের অধীনে যারা আছে, তাদের কি হাসতেও মানা?'

'তা আমি কি জানি?' লিলি তার একটা গোড়ালির উপর দেহের সব ভারটা চাপিয়ে আবার এক পাক ঘুরে নিয়ে বলে, 'জানি না বাবা! প্রোপ্রাইটার আমায় পাঠাল তোমাদের শাসন করতে, তাই এলাম।'

নিমাই চড়া গলায় বলে, 'তা হয়েছে তো শাসন করা? এবার যা আমাদের নামে লাগাতে-ভাঙাতে?'

'ভালো হবে না বলছি, নিমাইদা!' লিলি নিতাইয়ের লম্বা লম্বা চুলের মুঠিটা একবার ধরে নাড়া দিয়ে বলে, 'সব সময় তুমি আমার সঙ্গে লাগতে এসো না।'

ব্রজ একটা ছ্যাবলা মার্কা হাসি হেসে বলে, 'নিমাইবাবুর তো সেই তাল। সব সময় যাতে তোর সঙ্গে লেগে থাকতে পারে, সেই আশায়—'

বালিকা লিলি চেঁচিয়ে ওঠে, 'কেন? কেন সব সময় আমার সঙ্গে লাগতে আসবে? বলে দিচ্ছি গিয়ে—'

লিলি চলে গেলে এরা বলে, 'খুকিপনা আর গেল না!'

'যাবে কোথা থেকে? কর্তামশাইয়ের পুষ্যিপুত্তুর যে!'

'হুঁ তারপর দেখিস, খুকিটি হঠাৎ কোনোদিন কার সঙ্গে ভেগে পড়ে। সেই জ্যোচ্ছোনাবালার কথা মনে আছে তো? সে তো আর কর্তার পুষ্যিকন্যা ছিল না। কর্তা তাকে খাইয়ে পরিয়ে বড়োটি করেছিল অলক্ষ্যে ভোগে লাগাবে বলে, ব্যস্ চোদ্দ না পার হতেই নীল পাখি পালক গজিয়ে ফুড়ুৎ!'

'এই জগবন্ধু, ওকথা বলছিস কেন? কর্তার আর যাই দোষ থাক, ও দোষ নেই।'

'নেই, তোকে বলেছে। জ্যোচ্ছোনাকে কী রকম আগলাত মনে নেই? কারুর সঙ্গে একটু হেসে কথা কয়েছে কি মার-মার কাট্-কাট্! ওটি কি শুধু শুধু হয় বাবা! স্বার্থ চিন্তা থাকলেই তবে হয়।'

'ওটা কর্তার স্বভাব! মেয়েছেলেকে একচুল বিশ্বাস করে না! ছেদ্দাও করে না। নববালা, বাসমতী, এদের কী রকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে দেখেছিস তো? নেহাত কারে পড়ে দলে রাখতে হয় তাই, নচেৎ সেই আদ্যিকালের মতোন ব্যাটাছেলেগুলোকে গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজাতে পারলেই বোধহয় বাঁচত ও।'

তা কথাটা ওদের মিথ্যে নয়, অধিকারীর মনোভাবটা প্রায় সেই রকমই। বলেও যখন তখন— 'দলের মধ্যে পাঁচটা মেয়েছেলে পোষা কি কম ঝকমারি? একশোটা ব্যাটাছেলের যা না ঝঞ্ঝাট, একটা মেয়েছেলের জন্যে তা ঝঞ্ঝাট। কী করব, কালের গতিকে না রাখলেই নয়। এখন যে সব বায়োস্কোপ-দেখা চোখ হয়েছে বাবু বিবিদের! গোঁফ কামানো মুখ নিয়ে শাড়ি পরা দেখলেই হাসির হররা উঠে যাবে।'

দেখতে পারে না কুঞ্জ। একটা মেয়েকেও দেখতে পারে না। কাজেই তার সম্পর্কে 'স্বভাব দোষের' কথাটা নেহাতই গায়ের জ্বালা থেকে উদ্ভূত।

জ্যোৎস্না নামের মেয়েটাকে যে আগলে বেড়াত, সে শুধু সন্দেহ বাতিকে, আর শাসনেচ্ছু হয়ে। তবু রক্ষা করতে পারল না জ্যোৎস্নাকে, সে একটা তবলচীর সঙ্গে পালাল।

কুঞ্জ দাস যখন টের পেল, তখন কিন্তু লাফালাফিও করল না, 'মার-মারও' করল না। শুধু বলল, 'যে যার উপযুক্ত কাজই করেছে। 'কাঁঠালে মাছি' কি আর কাঁঠালী চাঁপায় বলতে যাবে? পচা কাঁঠালেই বসেছে।'

তবু আবারও মেয়ে নিতে হয়েছে প্রোপ্রাইটার মিস্টার দাসকে। এখনকার নায়িকা হচ্ছে চারুহাসিনী। নববালা আর বাসমতী গিন্নিদের পার্ট প্লে করে। তাদের নিতে কারো মাথা ব্যথা নেই, শুধু কুঞ্জ দাসের আছে কড়া শাসন। খাও দাও কাজ করো, ব্যস! আড্ডা, গল্প, ভালোবাসাবাসি, এসব চাও তো কেটে পড়ো।

শুধু এই আদুরী মেয়েটা? লিলি! তার প্রতি যে অধিকারীর কী ভাব বোঝা শক্ত। কখনও মনে হয় বেজায় প্রশ্রয় দিচ্ছে, কখনও মনে হয়, নাঃ ওসব কিছু নেই, সকলের প্রতিই সমান অপক্ষপাত অধিকারীর।

তবে লিলির জীবনটা একটু অদ্ভুত বইকি! সে জানে না কখন তাকে মাথায় তোলা হবে, আবার কখন তাকে পায়ে ছেঁচা হবে। হয়তো সেই জন্যেই লিলি 'বালিকা' থাকাটাকেই নিরাপদ মনে করে। তাতে মান অপমানের প্রশ্নটা কম থাকে। কখনও দলের মেয়েদের সঙ্গে হি হি করে, ছাঁচি পান চেয়ে খায়, ঝাল ঘুগনী এনে দেবার জন্যে বায়না করে, কখনও অধিকারীর তরফ হয়ে পাকাচোখা বুলিতে শাসন করে।

তা ওই দলের লোকেরা লিলিকে মুখে যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব দেখাক, মনে মনে না মেনে পারে না। কারণ অধিকারীর 'পুষ্যি কন্যে'। সময় অসময় তাই তোয়াজও করতে হয় তাকে।

তোয়াজ করে না শুধু বরুণ। ওই ব্রজ বিপিনের দল থেকে সে সম্পূর্ণ পৃথক। আর থাকেও সে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে। বরুণ 'পার্ট প্লে' করে না, বরুণ 'পালা' লেখে। বরুণের তাই কুঞ্জ দাসের কাছে

বিশেষ খাতির। একমাত্র বরুণকেই কুঞ্জ কখনও উঁচু কথাটি বলে না, কখনও 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' করে না।

বরুণের প্রতি কুঞ্জর যেন গুরুপুত্রের ভাব। কারণটা হয়তো ক্ষমতাবানের প্রতি অক্ষমের মুগ্ধতা। যে ক্ষমতা নিজের মধ্যে থাকবার ইচ্ছে কুঞ্জর, সে ক্ষমতা নেই তার। অথচ সেটা বরুণের কাছে।

কুঞ্জর ভিতরে ভাবের জোয়ার, অথচ সে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা নেই তার। বিপিনের কথা যদি সত্যি হয় তো কুঞ্জ অধিকারীর প্রথম এবং শেষ রচনা 'নারী না নাগিনী?'

কিন্তু বরুণের কলম হচ্ছে সাধা কলম। ধরলেই সফল। যাই ধরুক। কুঞ্জ বরুণের এই অপূর্ব শক্তিতে অভিভূত! তাই কুঞ্জ তার ভাব আর ইচ্ছে ব্যক্ত করে, আর অনুরোধ জানায়, 'লিখে ফেলো লেখক, এটা নিয়ে লিখে ফেলো। খুব জ্বলন্ত ভাষায়। সমাজের এই দুর্নীতি, বজ্জাতি, ওর ওপর দু'ঘা চাবুক বসানো দরকার। ব্যস্ শুরু হয়ে যায় লেখা।

কুঞ্জ দেখে সে যা চেয়েছিল ঠিক তাই। অথচ বুঝিয়ে বলতে কতটুকুই বা পেরেছিল সে? শুধু ইচ্ছে প্রকাশ করা! বরুণ যেন মনের ভিতরের কথা টেনে বার করে সুন্দর আর সহজ করে স্বচ্ছন্দে লিখে দেয়। কুঞ্জ আশ্চর্য হয়ে ভাবে, কই আমি তো এত সব গুছিয়ে বলিনি? অথচ যত শুনি ততই মনে হয় ঠিক, ঠিক এইটাই বলতে চাইছিলাম। নিজের মনের কথা লোকে না হয় লিখতে পারে, কিন্তু অপরের? অপরের মনের কথা লেখে কেমন করে? তা ছাড়া বরুণের ভাষার জোর কত! বরুণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা কত! আগাগোড়া পালাটাই যেন হীরে চুনী পান্না! মুহুর্মুহু হাততালি পড়ে কি আর সাধে? 'ভবানী অপেরা'র যাবতীয় মহিমার মূলে বরুণ। সেই বরুণকে পুজ্যি করবে না 'ভবানী অপেরা'র প্রোপ্রাইটার? তবে নাটকের নামকরণের ভারটি কুঞ্জর নিজের হাতে। এইটি তার নিজের এলাকা। মনে মনে আর একটি সংকল্প আছে কুঞ্জর, সেটা আজ পর্যন্ত ব্যক্ত করোনি কারও কাছে।

কিন্তু কুঞ্জর কি তাহলে মনের কথা বলবার কেউ নেই? সত্যিই কুঞ্জ নারীসম্পর্ক বর্জিত? তবে কুঞ্জ সুযোগ-সুবিধে পেলেই আমতা লাইনের কোন্ একটা গণ্ডগ্রামে যায় কেন? তা কুঞ্জ দাসকে জিগ্যেস করবে কে? 'আমতা লাইনের ওই গ্রামটায় তোমার কি কাজ?' এ কথা জিগ্যেস করতে গেলে তো চাকরি যাবে!

এই পালাদারদের যদি 'আসল বাস' বলে কিছু থাকে তো কুঞ্জর আসল বাস কাটোয়ায়। সম্প্রতি এদিক ওদিক ঘুরে এসে, কিছুদিন আবার কাটোয়ায় স্থিতু হয়েছে কুঞ্জ। আর নতুন একটা নাটক লেখা চলেছে।

কোণের দিকের একখানা ঘরে কুঞ্জতে আর বরুণেতে চলছে নিভৃত পরামর্শ। হাতের কাছে কোনো 'বায়না' নেই বলে ব্রজ আর বিপিন ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। বাসমতী গেছে তার গুরুপীঠ নবদ্বীপে। জগবন্ধুর এই কাটোয়াতেই বোনের বাড়ি, তাই এখানে যখন থাকা হয়, জগবন্ধু বোনের বাড়িতেই থাকে, খায়। কাজেই দল এখন হালকা, কাজকর্ম কম।

নিমাইয়ের হাতে কিছু টাকা ধরে দিয়েছে কুঞ্জ, বলেছে, 'তোতে আর সনাতনেতে পালা করে দোকান বাজার করবি, নববালা রাঁধবে, ব্যস্! কোনো যেন গণ্ডগোল শুনি না, দু'বেলা যেন ঠিক সময়ে খাবার পাওয়া যায়। এই হচ্ছে আমার সাফ্ কথা। বেতিক্রম হলে কুরুক্ষেত্তর করব।'

অতএব ঠিক মতো কাজ চলে। কারণ কুরুক্ষেত্তর করবার ক্ষমতা যে কুঞ্জর আছে, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যারা পড়ে আছে, তাদের তিন কুলে কেউ নেই বলেই তো পড়ে আছে।...তারা তো সন্ত্রস্ত থাকবেই।

তবে কুঞ্জ এবার মনের সুরটি বদলেছে। গলা নামিয়ে বরুণকে নির্দেশ দিচ্ছে, 'চাবুক-টাবুক' তো ঢের হল নাট্যকার, এবার একটা রোমান্টিক পালা লেখো দিকি।

রোমান্টিক! কুঞ্জর অভিলাষ! ভূতের মুখে রামনাম!

বরুণ অবাক হয়ে বলে, 'রোমান্টিক? হঠাৎ এ খেয়াল যে, মিস্টার দাস?'

এই—এই আর একটি গুণের জন্যেও বরুণ কুঞ্জর প্রিয়পাত্র। 'মিস্টার দাস' ছাড়া কখনও আর কিছু বলে না বরুণ।

মিস্টার দাস অতএব হৃষ্টচিত্তে বলেন, 'মাঝে মাঝে নতুনত্বের দরকার, বুঝলে? ভেবে ভেবে এটাই এখন ঠিক করেছি আমি। 'ভবানী অপেরা' মানেই জ্বলন্ত আগুন, এটাও ঠিক নয়, একটি ফুটন্ত গোলাপ দেবার ক্ষমতাও যে 'ভবানী অপেরা' রাখে, সেটা দেখানো দরকার।'

বরুণ স্বল্পভাষী, বরুণ 'স্বল্প হাসি'-ও। সেই স্বল্প হাসিটুকু হেসে বরুণ বলে, 'কিন্তু আমার তো মনে হয় না সেটা দেখে লোকে খুশি হবে!'

'হবে না? বল কি নাট্যকার? তোমার লেখা নাটক, তাও যদি আবার রোমান্টিক হয়, লোকে তো লুফে নেবে।'

'আমার ওপর এত আস্থা রাখবেন না'—বরুণ বলে, 'লোকের ধর্ম যে কী তা বোঝা বড়ো শক্ত, মিস্টার দাস। 'লোক-চরিত্র' স্বয়ং ভগবানেরও অজানা। ওযে কিসে রুষ্ট, কিসে তুষ্ট! তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, কেউ যদি একটা কিছু বিশেষ জিনিস দিতে পারল আর লোকের ভালো লেগে গেল তো লোকে তার কাছে কেবল সেইটাই চাইবে। যে লোক কমিক করছে, তাকে চিরদিনই ওই কমিকের ভাঁড়ামিই চালিয়ে যেতে হবে। একটা গভীর জিনিস কি সিরিয়াস জিনিস, কেউ নেবে না তার কাছে। তেমনি আপনার এই 'ভবানী অপেরা'র কাছে লোকে অবিরত ওই চাবুকই চাইবে, মধুর কিছু দিতে যান, হয়তো 'ফেলিওর' হতে হবে! লোকে বলবে, দুর—'ভবানী অপেরা' আর আগের মতো নেই'।

কুঞ্জ সন্দেহের গলায় বলে, 'বাঃ, কেন তা বলবে? লোকে তো নতুনই চায়?'

বরুণ হাসে, 'চায়! নতুনের কাছে চায়!'

'এ কথা তোমায় কে বলল বলত, নাট্যকার? বয়েস তো তোমরা এই বাছা, লোকচরিত্র এত দেখলে কোথায়?'

'দেখবার চোখ থাকলে, দেখতে বেশি সময় লাগে না, মিস্টার দাস!'

'হুঁ। তা বটে! নইলে এতগুলো অমন আগুন-আগুন নাটক লিখলেই বা কি করে? তবু আমার ভারী একটা সাধ হয়েছে, রোমান্টিক একটা লেখো তুমি! আজই শুরু করে দাও।'

বরুণ হাসে, 'ভাবতে হবে না?'

'ভাবতে? আরে বাবা, রোমান্টিকের আবার ভাবাভাবির কী আছে? দুটো তরুণ তরুণী খাড়া করে, হয় তাদের—ওই তোমার গিয়ে কি বলে—পূর্বরাগ অনুরাগ ঘটিয়ে বিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেবে, নয়তো অগ্রে মিলন, মধ্যে বিরহ, পরে আবার মিলন, এইভাবে ছক কেটে ফেলো—'

বরুণ বলে, 'তাহলে পৌরাণিক কি ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র নিয়ে কাজ করলেও হয়।'

কুঞ্জ হাঁ হাঁ করে ওঠে—'না না, ওসবে দরকার নেই। ওসব কি আর কেউ বাকি রেখেছে হে? পড়ে আছে পুরাণে ইতিহাসে, আবহমানকাল ধরে যে পারছে ধরছে আর চোরের মার মারছে। না না, তুমি বাপু কাল্পনিক চরিত্রই গড়ো।'

বরুণ মৃদু হাসে। তারপর আস্তে বলে, 'কাল্পনিক চরিত্র মানেই সে আজকালকার জীবন? আজকের জীবনে রোমান্স কোথায়, মিস্টার দাস?'

কুঞ্জ অধিকারী 'মিস্টার দাসে'র মহিমা ভুলে চোখ গোল করে বলে ওঠে, 'নেই? রোমান্স নেই? তুমি যে তাজ্জব করলে হে লেখক, আমি তো দেখি এটা রোমান্সেরই যুগ। এত রোমান্স যে, ঘরের দেওয়ালে আর আটক খাচ্ছে না, পথেঘাটে, হাটেবাজারে, মাঠেময়দানে রোমান্সের ছড়াছড়ি!'

'আপনি শহরের ফুটপাথের দোকানগুলো দেখেছেন, মিস্টার দাস? মুক্তোর মালার ছড়াছড়ি!'

কুঞ্জ দাস এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হঠাৎ 'ওহো হো-হো' বলে বরুণের পিঠটা চাপড়ে দেয়। তারপর বলে, 'খুব উত্তরখানা দিয়েছ বটে:...কিন্তু তুমি যাই বলো, আমি নিরুৎসাহ হচ্ছি না। আমার এবার বিশেষ বাসনা—'

বরুণ হেসে বলে, 'তবে তো ভাবতে হয়।'

'ভাবো,—ভেবে প্লট ঠিক করে ফেল। আবার আসছি আমি, তুমি কতকটা খসড়া করো। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই রোমান্টিকের মধ্যেও সমাজচিন্তা থাকবে। প্রেম করলাম বলেই যে বেহেড্ হয়ে প্রেম করব তা নয়।'

কেন কে জানে বরুণের হঠাৎ মেজাজ বদলে যায়। বরুণ হঠাৎ রুক্ষ গলায় বলে, 'হেড্ বেহেড্ জানি না, মিস্টার দাস, প্রেমের নাটক লেখা আমার দ্বারা হবে না।'

কুঞ্জ দাস কি ক্রুদ্ধ হয়? না উৎফুল্ল? বোঝা যায় না। কারণ কুঞ্জ দাসের মুখটা গম্ভীর দেখাচ্ছে, কিন্তু চোখটা যেন আলো-আলো। তা হয়তো বা রাগের আগুন। এবার হয়তো কুঞ্জ তার এতদিনের পুজ্যি 'লেখক'কে অসম্মান করে বসবে! কিন্তু চট করে তা করে না বুদ্ধিমান কুঞ্জ দাস। সে শুধু গম্ভীরভাবে বলে, 'হবে না কেন, সেটা শুনতে পাই না?'

'হবে না। হবে না। এর আর 'কেন'র কি আছে?' বরুণ অবহেলার গলায় বলে—'ওসব আমার হাতে আসবে না।'

কুঞ্জ এবার একটু ঘনিষ্ঠ হয়, গলা নামিয়ে বলে, 'ব্যাপার কি বল তো নাট্যকার? কোথাও দাগা টাগা পাওনি তো?'

বরুণ আরও অগ্রাহ্যের গলায় বলে, 'মাপ করবেন, স্যর! আমার কোনো অতীত ইতিহাস আবিষ্কার করতে বসবেন না। আপনাদের ওই 'লাভ' ব্যাপারটাতেই আমার অশ্রদ্ধা! 'প্রেম' বলে সত্যিই কিছু আছে নাকি? রাবিশ!'

কুঞ্জ আলগা গলায় বলে, 'একেবারে রাবিশ?'

'আমার কাছে অন্ততঃ! ওসব শুনলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বিয়ে কর, ঘর সংসার কর, আপত্তির কিছু নেই। সেটা হচ্ছে লেনদেনের ব্যাপার। একটা চুক্তিপত্রের ব্যাপার। আমি তোমায় স্বামী সংসার দিলাম, সামাজিক পরিচয় দিলাম, তুমি আমায় স্ত্রী-পুত্র দিলে, রোগে-অসুখে দেখলে, চুকে গেল। তা নয় প্রেম, লাভ, মিলন, বিরহ। জগতে যা নেই, তাই নিয়ে কচকচি। এসব পালা লেখাতে হলে আমায় ছাড়ুন, মিস্টার দাস!' বরুণ কলমটা কামড়াতে থাকে।

কুঞ্জ অধিকারী মানী লোক, তবু আশ্চর্য, এতবড়ো অপমানেও আহত হয় না। বলে, 'চটছ কেন নাট্যকার, চটছ কেন? ভাবলাম একটা নতুনত্ব করা যাক। যাক্‌গে, দরকার নেই। ওই যে সেই কালোবাজারীদের নিয়ে কি একটা লিখবে বলছিলে—'

বরুণ আত্মস্থ। বলে, 'আমি বলিনি, আপনি বলেছিলেন—'

'ও সে একই কথা! সেটাই করো।'

কুঞ্জ দাস ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু ব্যাজার মুখে নয়। কুঞ্জ দাসের মুখে বরং যেন একটা আশার দীপ্তি।

এই রকম মুখ দেখালেই কুঞ্জকে আমতা লাইনের সেই গ্রামের পথটায় হাঁটতে দেখা যায়। যখন যে নাটকটা নামায়, সেটায় হইচই পড়লে, নতুন মেডেল পেলে, বাবুদের দু'কথা শোনাতে পারলে—কুঞ্জ ট্রেনের টিকিট কাটে। কুঞ্জ এক-আধবেলার জন্যে হাওয়া হয়ে যায়। আর কুঞ্জ হাওয়া হলেই দলসুদ্ধ সকলের পোয়া-বারো।

মায় কোমরে বেল্ট আঁটা লিলির পর্যন্ত। লিলি সেদিন 'খুকি'র খোলস ছেড়ে তরুণী হয়ে ওঠে।

ফ্রকের ওপরেই যাত্রার সাজের একটা শাড়ি জড়ায়। আর নিমাইয়ের কাছে গিয়ে তার গা ঘেঁষে বলে, 'প্রোপ্রাইটার নেই বলে, খুব ভোজ লাগানো হচ্ছে, না?'

নিমাই মুচকি হেসে বলে, 'তা হবে না কেন? তুইও তো সুযোগ পেয়ে হিরোইন সেজে বসে আছিস!...কী বলব লিলি, শাড়িতে আর ওই ঘাগরাতে যেন আকাশ-পাতাল তফাত দেখায় তোকে।'

লিলি তার সেই 'অবোধ শিশু চক্ষে' এমন একটি কটাক্ষ করে, যা দেখতে পেলে রাগে কুঞ্জ অধিকারীর বুক ধড়ফড় করে উঠত। আর হয়তো মেয়েটাকে ধরে চাবুক পেটাতে যেত।

কুঞ্জ তার পুষ্যি কন্যেকে খাটো ফ্রক আর আঁটো জ্যাকেট পরিয়ে খুকি করে রেখে নিশ্চিন্ত আছে। তবে কুঞ্জ মেয়েটাকে 'বাবা' বলতে শেখায়নি, অদ্ভুত ওই ডাকটাতেই অভ্যস্ত লিলি : 'পোপাইটার'।

ছেলেবেলার আধো উচ্চারণটাই রয়ে গেছে জিভে। তবু লিলি প্রায় বাপের চোখেই দেখে কুঞ্জকে। তাই কুঞ্জ যখন স্টেশনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে, লিলি গিয়ে আদুরে গলায় বলে, 'আমায় নিয়ে যাওয়া হয় না একবারও। এ্যাঁ। আমি যেন মানুষ নই!' লিলিকে তখন শিশুর মতো দেখতে লাগে। কুঞ্জ তাই নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত কুঞ্জ বলে, 'মানুষ আবার কিরে? মানুষ কাকে বলে? বাছুরকে কি গরু বলে? ব্যাঙাচিকে ব্যাং? বলি ডাবকে কি নারকেল বলে? এঁচড়কে কাঁঠাল? মানুষ হবার বয়েস হবে, তবে তো মানুষ হবি?...তা, এখন আমি বেরোচ্ছি—নিমাইদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবি না, বুঝলি? আর নববালার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।'

লিলি মাথা নেড়ে ঝঙ্কার দেয়, 'তোমার আদরের নিমাই যা ঝগড়াকুটে! ওই তো ঝগড়া বাধায়। আমাকে 'তুই' বলে, 'আহ্লাদী' বলে। আমরা রাগ হয় না?'

কুঞ্জ মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, 'ভালো তো কোনোটাই নয়। সনা, জগা, সব ক'টাই তো পাজীর পাঝাড়া।'

লিলি একগাল হাসির সঙ্গে বলে, 'যা বলেছ! ছোটোলোক এক একটা!'

কুঞ্জর এ সময় মেজাজ শরীফ। স্টেশনে যাবার সময় কুঞ্জকে বাসমতী নববালার সঙ্গেও হেসে কথা কইতে দেখা যায়। লিলির সঙ্গে কইবে সে আর আশ্চর্য কি! হেসে উঠে বলে, 'তা একটা ভদ্দরলোক তো আছে। ভদ্দরের মতোন ভদ্দর, তার কাছে বসে থাকলেই পারিস। তোকে আর তাহলে জ্বালাতে আসবে না ওরা।'

লিলি মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'সে ভদ্দরলোকটা আবার কে গো, পোপাইটার?'

'কেন, বরুণ? যাকে বলে ভদ্দর!'

লিলি ঠোঁট ওল্টায়। 'বরুণ? লেখকবাবু? সে যা দেমাকী! কথাই কয় না আমার সঙ্গে!'

কুঞ্জ সহসা কৌতূহলী হয়, 'কথাই কয় না তোর সঙ্গে?'

'মোটে না।' লিলি ঝঙ্কার দেয়, 'কী লিখছে একটু দেখতে গেলে এ্যাইসা খিঁচোয়! বলে, পালা, পালা বলছি। কাজের সময় গোলমাল করতে আসসনি।—তোমার দলের কেউ ভালো নয়।'

কুঞ্জ বলে, তুই তো ভালো, তাহলেই হল। বলে ওর হাতে দু-একটা টাকা গুঁজে দিয়ে হাসিহাসি ভাবটাকে চাপা দিতে দিতে বেরিয়ে যায়।

'যাক এখন দশ-বারো ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্দি'—এঘরে এসে পা ছড়িয়ে বসে লিলি। চোখ মুখের ভঙ্গি করে হাতের টাকা নাচাতে নাচাতে বলে, 'এই দেখো, নিমাইদা!'

নিমাই ব্যাজার মুখে বলে, 'দেখে কি করব? বেল পাকলে কাকের কি? রাজা ধন বিলোচ্ছেন কোথায়? না অন্তঃপুরে। কুড়োচ্ছেন কে? রাজকন্যে। এই তো?'

লিলি টাকা নিয়ে লোফালুফি করতে করতে বলে, 'আমি তো রেল ভাড়া জমাচ্ছি।'

'রেল ভাড়ার দরকার কি?' নিমাই বলে, 'এবার তো নাটক দেখাতে কলকাতায় যাওয়াই হচ্ছে। নাটকের লড়াই হবে, কারটা ফার্স্ট হয়! যেমন হয়। গেলে তো দলবল সবাই যাব।...আর কলকাতার শহরে একবার হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করে কার সাধ্য!'

'পালাটা কি?'

'তা জানিনে! কোন্‌টি বাছবে কে জানে। মোট কথা যাওয়া হবে। বরুণবাবু তো আবার পালা লিখছে!'

'বরুণবাবু!' লিলি মুখটা বাঁকায়, 'যা তুচ্ছু-তাচ্ছিল্য করে আমায়! দেখলে গা জ্বলে যায়।'

নিমাই হাসে, 'গা জ্বললে আর কি হবে, কর্তা তো ওকে জামাই করবে ঠিক করেছে।'

'ঠিক করেছে!' লিলি পনেরো বছরের মুখে পঁচিশ বছরের ভঙ্গি করে বলে, 'ঠিক করলেই হল? আমার দায় পড়েছে।'

'কর্তা জোর করলে কী করবি?'

'আহা রে! কী করব যেন জানেন না!' চওড়া জরির কোমরবন্ধটার ওপর হাত রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ায় লিলি, 'এখন আবার ন্যাকা সাজছ যে?'

নববালা জল আনতে গিয়েছিল, ঘড়াটা এনে দুম করে বসিয়ে রেখে কটু গলায় বলে, 'বামুন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর। কর্তা বেরিয়েছে, আর ফষ্টিনষ্টি হচ্ছে, কেমন?'

খাঁটো স্কার্ট আর আঁটো জ্যাকেটের মধ্যে থেকে ফোঁস করে ওঠে, 'তোমার খেয়ে ফষ্টিনষ্টি করছি। তুমি বলবার কে?'

'ওমা! মেয়ে দেখ! যেন ফণা ধরা ফণিনী!' নববালা গমগম করে চলে যায়।

কুঞ্জর অনুপস্থিতিতে দলের চেহারাটা অনেকটা এ রকমই। এখন তবু সবাই নেই, থাকলে দেখবার মতো। তবু মাঝে মাঝে কুঞ্জ অনুপস্থিত হবেই।

কুঞ্জ সেই একটা নামহীন পরিচয়হীন গণ্ডগ্রামে পৌঁছে, তার মাঠের মাঝখান দিয়ে পুকুর ধার দিয়ে সরু একটা পায়ে চলার পথ ধরে গিয়ে উঠবে একখানা জরাজীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে। উঠোনের বেড়ার দরজাটার বাঁধন দড়িটা খুলে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে।

আজও তেমনি দাঁড়াল। কিন্তু আশ্চর্য, বেড়ার দরজার সাড়া, জুতোর শব্দ, এই দুটো ঘটনাতেও সামনের ঘর থেকে কোনো সাড়া এল না। অথচ ঘরের মধ্যে মানুষ নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে তা টের পাওয়া গেল। দেখা গেল না কাউকে, তবু কুঞ্জ দাস দাওয়ায় উঠে পড়ে পা ঝুলিয়ে বসল। পিঠটা ঘরের দিকে। গলা তুলে বলল, 'বাড়ি ঘর আলগা রেখে বাড়ির লোক উধাও! চোর ঢুকল বাড়িতে তা হুঁশ নেই।'

কথার উত্তর এল না, শুধু ভিতরের নড়া-চড়াটা যেন আরও স্পষ্ট হল।

কুঞ্জ দাস সেইভাবেই বলল, 'মনস্থির করে ফেললাম! ওখানেই মেয়ের বিয়ে দেব।'

এবার হঠাৎ ঘরের বাতাস অলক্ষ্যে কথা কয়ে উঠল, 'ওইখানটা আবার কোন্‌খানটা? চাল-চুলো আছে নাকি?'

কুঞ্জ এবার গলাটাকে আরও দরাজ করে, 'যে চালের নীচে আছে সেইটাই তার চাল, যে চুলোয় খাচ্ছে সেইটাই তার চুলো।'

আবার শব্দভেদী বাণ, 'অধিকারীর সব্বস্বর উত্তরাধি-কারী হবে তো ওই কুড়োনো মেয়েটা। যার জাতের ঠিক—'

'থাক্ থাক্, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই জাত-টাত আমি মানি না!'

অলক্ষ্য থেকে—'তা হঠাৎ মনস্থির করবার হেতু?'

'করছিলামই! নতুন করে আবার বাজিয়ে নিলাম। রোমান্টিক পালা নিতে বললাম, বলল, —আমার দ্বারা ওসব প্যান-প্যানানি হবে না।—ব্যস্, করে ফেললাম মনস্থির—'

ঘর থেকে অবাক গলা ভেসে আসে, 'এতে কি হল?'

'কী হল?' কুঞ্জ দাস একটি রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'বোঝা গেল, সাচ্চা পুরুষ ছেলে। ন্যাকা ভালোবাসাবাসির ধার ধারে না। তবু আরও একটু বাজাব!'

ভিতর থেকে এবার একটু স্থির স্বর শোনা যায়। স্থির, ভারী! 'যে ছেলে ভালোবাসার ধার ধারে না, সেই তাহলে কন্যে সম্প্রদানের পক্ষে সুপাত্র?'

'আলবত! আর তার কথাবার্তা কী জোরাল! বলে,—বিয়ে বুঝি, ঘর সংসার বুঝি। সেটা হচ্ছে বিজিনেসের মতোন লেন-দেনের ব্যাপার। রোমান্স আবার কি? নেই ওসব এযুগে!'

'ওঃ! তাহলে আগের যুগে ছিল!'

'ছিল, সেই রাধাকেষ্টর আমলে ছিল। ব্যস্। তারপরে আর না। যা আছে, সবটাই বখামি, আর ন্যাকামি!'

'ওঃ! ভালো কথা।'

আলাপ চলছে। অথচ সেই দূর ভাষণে। একজন দেওয়ালের আড়ালে, আর একজন পিঠ ফিরিয়ে। তবু কথা কাটাকাটিরও কসুর নেই।

একটা গলা বলছে, 'বিয়ে দেবার আগে মেয়ের ইতিহাসটা বলতে হবে।'

আর একটা গলা জোর গলায় জবাব দিচ্ছে, 'কেন? কী দায় পড়েছে? ওরই বা তিন কুলে ক'টা গার্জেন আছে?'

'তবু তো ভদ্দর ঘরের ছেলে!'

'কুঞ্জ দাসও অভদ্র ঘরের ছেলে নয়!'

'মেয়েটা তো শুনেছি দাস মশাইয়ের কুড়োনো মেয়ে!'

'কুড়োনো তো কুড়োনো! অন্নজলের কোনো দাম নেই?'

'তা বটে! কিন্তু বেলগাড়ির হাতমুখ ধোওয়া হবে, না ধুলো পায়েই বিদায়?'

'তা সেটা হলেই ভালো হত, নিতান্তই ক্লান্ত, তাই—'

অতঃপর এক সময় দেখা যায় কুঞ্জ সেই উঠোনটা পার হয়ে পিছনের এটা দরজা খুলে পুকুরে হাত পা ধুচ্ছে।

এক সময় দেখা যায়, সেই দালানেই একধারে পাতা আসনে বসে পড়েছে কুঞ্জ, সামনে পরিপাটি করে বাড়া অন্নব্যঞ্জন।

আচ্ছা, লোক তো ত্রিসীমায় নেই, এসব করল কে? ভূতে নাকি?

তা তাই। ভূতই!

কুঞ্জ যখন হাতমুখ ধুয়ে বলল, 'যাই একবার মিষ্টির দোকানটা ঘুরে আসি', আকাশে তখন ঝিকিমিকি বেলা। অথচ তখন এই ক্ষুদ্রকায় বাড়ির ক্ষুদ্রকায় রান্নাঘরটার মধ্যে দুটো উনুন জ্বলে উঠেছে। শুকনো কাঠ গোছানো ছিল বোধহয়।

মিষ্টি কিনে আরও খানিক এদিক ওদিক ঘুরে কুঞ্জ যখন ফিরল, তখন আসন পাতা, অন্ন প্রস্তুত।

কুঞ্জ আবার পিঠ ফিরিয়ে বসে, আর বলতেই হবে—ভূতে ভাতের থালা নামিয়ে রেখে যায়।

খাওয়া মেটে, তবু অনেকটা রাত পর্যন্ত এমনি লুকোচুরি খেলা চলে। তারপর একজন বলে, 'বাড়ি ফিরতে হবে না?'

আর একজন বলে, 'বাড়ি না ঘোড়ার ডিম! সরাইখানা!'

'তা সেই সেখানেই—'

'ট্রেন তো সেই ভোরে।'

'তাই আছে চিরকাল।'

'তার মানে সমস্ত রাত ইস্টিশানের চালার নীচে পড়ে থাকা!'

'তা মানে তাই দাঁড়ায় বটে।'

অগত্যাই রাগ-রাগভাবে উঠে পড়ে কুঞ্জ দাস। বলে, 'আর আসছি না।'

ভিতর থেকে ছোট্ট একটু শব্দ, 'আচ্ছা!'

কুঞ্জ গমগমিয়ে বলে, 'আচ্ছা? হুঁঃ! জানা আছে কিনা আসতেই হবে মুখে কুটো নিয়ে!'

'কেন? কে আসতে দিব্যি দিয়েছে?'

'কে দিব্যি দিয়েছে? ওঃ, খুব বোলচাল শেখা হয়েছে। কিছুদিন কলকাতায় বাস করে এই উন্নতিটি হয়েছে!'

'যাত্রার দল খুলেও সে উন্নতি কম হয়নি।'

'হুঁ! চোটপাটটি ঠিক আছে। যাক বিদেয় হওয়া যাক!' বলে অধিকারী কুঞ্জ দাস গেঁজে থেকে এক গোছা নোট বার করে সামনের ওই ঘরটার দরজার কাছে নামিয়ে রেখে গলা তুলে বলে, 'কাগজের টুকরো ক'খানা তুলে রাখা হোক। ইঁদুরে না কাটে।'

এবার ঘর নিঃশব্দ।

কুঞ্জ গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে বলে, 'বাগদী মেয়েটা এসে কাজকর্ম ঠিকমতো করে দিয়ে যায়?'

'যায়।'

কুঞ্জ ছাতাটা দাওয়ার পাশ থেকে উঠিয়ে নিয়ে উঠোনে নামে, জুতোটা পায়ে দেয়, বেড়ার দরজাটা খুলে বেরোয়, বাইরে থেকে আবার সেটা আটকে দেয়, তারপর সেই পায়ে চলা পথটা ধরে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে পকেট থেকে টর্চ বার করে আলো ফেলতে ফেলতে।

সারারাত এখন স্টেশনের সেই করোগেটের চালাটার নীচে পড়ে থাকতে হবে, রাত্রি শেষে ট্রেন। অভিজাত স্টেশন নয় যে, ওয়েটিং রুম থাকবে।

তবু মরতে মরতে এখানে আসতে হয় কুঞ্জ দাসকে। মাঝে মাঝেই আসতে হয়। ওই কাগজের টুকরোগুলোর পরমায়ুর কাল আন্দাজ করে করে তো আসতেই হয়। অকারণেও হয়। হঠাৎ মন ভালো হবার যোগ এলে, নাটক জমলে, মেডেল পেলে। এই পায়ে চলা পথটা যেন প্রবল আকর্ষণে টানতে থাকে কুঞ্জকে।

কিন্তু কেন? কিসের দায়ে বাঁধা কুঞ্জ?

তা সে কথা যদি বলতে হয় তো অনেকগুলো বছর আগে পিছিয়ে যেতে হয়। মন দিয়ে শুনতে হয় একটা কুলত্যাগিনী মেয়ের নির্লজ্জ ধৃষ্টতার ইতিহাস। সংসারে আর কোথাও কেউ এতখানি ধৃষ্টতা দেখিয়েছে কিনা সন্দেহ।

তবে কুঞ্জ দাসকে দেখতে হয়েছে। কুলত্যাগিনী ওই মেয়েটার দুঃসাহসিক আবদার রাখতেও হয়েছে তাকে।

কুঞ্জ যখন একটা জ্বালার মন আর তার দলবল নিয়ে যেখানে সেখানে 'চাবুক' বসিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন একদিন কুঞ্জ একখানা চিঠি পেল। হাতের লেখা দেখে প্রথমে ছিঁড়ে ফেলতে গেল। তারপর আস্তে আস্তে শুধু খামের মুখটা ছিঁড়ল।

দেখল ক'টা মাত্র লাইন। সম্বোধনবিহীন—

'....নির্লজ্জতার সীমা নেই। তা হোক, নির্লজ্জের আর লজ্জা কি? মরতে বসেছি একবার এসে দাড়াতেই হবে। নিচে ঠিকানা দিলাম।'

কলকাতার পুব অঞ্চলে একটা গলি-পথের ঠিকানা।

চিঠিখানা নিয়ে সেদিন কুঞ্জ সারারাত পায়চারি করল, তারপর সকালে একটা কাগজে লিখল, 'এখনও মুখ দেখাতে সাহস?' খামে ভরল, উচিতমতো স্ট্যাম্প মেরে ফেলে দিল। তারপর মনের জোর করে নাটকের মহলা দেখতে বসল।

কিন্তু নির্লজ্জতা আর ধৃষ্টতার চরম পরাকাষ্ঠার নমুনা নিয়ে আবার একছত্র চিঠি এল, 'তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্যি মুখ দেখাব না। তবু না এলেই নয়।'

অধিকারী কুঞ্জ দাস হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল। গায়ে জামা চড়িয়ে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে একখানা কাপড় গেঞ্জি আর যতগুলো পারল টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সেখানে গিয়ে দেখে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। একটা সরু গলির মধ্যে পাকা গাঁথুনির এক বস্তি, তারই একটা ঘরের সামনে একটা মড়া পড়ে। জোয়ান বয়সের পুরুষের মড়া। চেহারা প্রায় সুকান্তি। মরে গেলেও বোঝা যাচ্ছে।

কুঞ্জ গিয়ে পড়তেই একটা সোরগোল উঠল।

অনেকগুলো মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে কথা কয়ে উঠল। ঘরের মধ্যে একটা মেয়ে-গলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'ভাসুর বুঝি? তা বিপদের সময় অত ভাসুর ভাদ্দরবৌ মানলে চলে?'....তারপর কোন্ ঘর থেকে একটা বয়স্ক বেটাছেলে বেরিয়ে এসে হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনিই বুঝি অমলবাবুর দাদা? তা ভাই মরে গেল তবে এলেন? প্রতিজ্ঞে ছিল বুঝি মরামুখ দেখবেন? তা তেমন প্রতিজ্ঞের উপযুক্ত লোকই ছিলেন বটে শ্রীযুক্ত অমলবাবু! মরে গেছেন, আর বলতে কিছু চাই না। তবে চটপট ব্যবস্থা করে ফেলুন মশাই।'

করতেই হল ব্যবস্থা। কোথাকার এক মফস্বল শহরের কমল মুখুজ্যের ছেলে অমল মুখুজ্যের লিভার পচে মরা দেহটার সদগতি করতে নিয়ে গেল কুঞ্জবিহারী দাস। মুখাগ্নিও সেই করল, কারণ তখন সে অমল মুখুজ্যের দাদা।

ভাদ্দরবৌ! সামনে বেরোয় না। কিন্তু কথা না বললে চলছে না। দরজার আড়াল থেকে বলে, 'আর কিছুদিন আগে এ দয়া হলে দেশের লোকটা বিনি চিকিচ্ছেয় মরত না।'

কুঞ্জর চারিদিকে দু'ডজন করে চোখ কান। কুঞ্জ তবু গলা নামিয়ে বলে, 'বড়ো দুঃখ হচ্ছে, না?'

'তা একটা মানুষ বেঘোরে মরলে হয় বৈকি দুঃখ।'

'আমার একটা বাসনা পূর্ণ হয়েছে!' কুঞ্জ চাপা নিষ্ঠুর গলায় বলে, 'মুখে আগুন ধরাবার বাসনাটা পূর্ণ হল।'

'আরও একটা মুখ তো বাকি—' ঘরের ভিতরটা যেন আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে কথা কয়ে ওঠে, 'সেটারও কি এ গতি হবার আশা আছে?'

কুঞ্জ গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'গ্যারান্টি দিতে পারছি না।'

'তা যাক। মুখে আগুন দেওয়াটা ভাগ্যচক্র। যে জন্যে ডেকেছি, বলি—'

বলল সেই কথা, সেই দুঃসাহসিক মেয়ে মানুষটা! বছর তিনেকের একটা মেয়ে আছে তার, সেটার ভার নিতে হবে কুঞ্জকে।

ভার নিতে হবে মানে? মানে কিছুই নয়। নিতেই হবে তাই। সেটাই বক্তব্য ওই অদর্শনার। মেয়েটার বাপ মরেছে নানা রোগে, মা মরবে, মানে মরতে বসেছে যক্ষায়, অতএব পরোক্ষে মেয়েটা ডাস্টবিনে যাবে। কুঞ্জ ভার না নিলে নেবে কে? পথের কুকুর বেড়াল ছানার মতো মরবে?

তা মরুক না। কুঞ্জর কী লোকসান তাতে? অমন কত মরছে জগতে।

হ্যাঁ, সেই জবাবই দিয়েছিল কুঞ্জ। চোটপাট বলেছিল, 'বেড়াল কুকুরের মতো সে অপেক্ষাই বা কিসের? শানে আছাড় দিলেই তো চুকে যায়।'

'তো, তা হলে তাই দিয়ে যেতে হবে—' অন্তরালবর্তিনী বলেছিল, 'সেটাও একটা উপকার করে যাওয়া হবে। ওর মায়ের তো সেটুকু ক্ষমতাও নেই গায়ে।'

'হুঁ! তারপর? সেই জননীটির শেষ গতি কি হবে?'

'তার গতি?' একটু হাসি শোনা গিয়েছিল, 'যক্ষ্মা হাসপাতালের মুদ্দফরাশ নেই!'

'তা ভালো! উঁচুদরের গতির ব্যবস্থা হয়ে আছে তাহলে! তা হাসপাতালের ব্যবস্থাটা হয়েছে?'

'হবে! বাড়িওলাই নিজের গরজে টেনে ফেলে দিয়ে আসবে। যাক মেয়েটাকে আছড়ে দেওয়ার কাজটা সেরে যাওয়া হয় যেন।'

পাশের ঘরে এধারে ওধারে অনেকগুলো কান ভাসুর ভাদ্দরবৌয়ের আলাপ শোনার আশায় উদগ্র হয়েছিল। তারা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ঘোমটার ভেতর খ্যামটা নাচ!'

আরও অনেক কিছুই বলল তারা। এবং অপেক্ষা করতে লাগল, লোকটা বিদেয় হলে আচ্ছা করে একবার শুনিয়ে ছাড়বে বামুন বৌকে।—বলি এতই যদি কথার বান, মুখ দেখাদেখিতেই যত দোষ? আরও বলবে—ভেতরে ভেতরে এতবড়ো একটি ব্যামো পুষে রেখে এতগুলো লোককে মজাচ্ছ তুমি?

কিন্তু শুনিয়ে দেবার আসাটা আর মিটল না তাদের।

লোকটা চলে গেল না।

গেল একেবারে বামুনবৌকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে, আর তার বাচ্চা মেয়েটাকে নতুন জামাজুতো পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে।

হাসপাতালের খরচের দায়িত্ব তো অগত্যা কুঞ্জ দাসকেই নিতে হবে। আর রুগীটা যখন মরবেই তখন তার মা-মরা মেয়েটারও যাবজ্জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নিতেই হবে। উপায় কি? মানুষ বৈ তো জন্তু জানোয়ার নয় কুঞ্জ?

কিন্তু আশ্চর্য, রুগীটা মরল না। অখাদ্যের প্রাণ যমের্য অরুচি বলেই হয়তো মরল না, সারল। অতএব হাসপাতালের জায়গা জুড়ে আর থাকা চলল না।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে অনেক অবস্থা পার হয়ে, অবশেষে আমতা লাইনের একটা গণ্ডগ্রামের এই আশ্রয়। সাড়ে সাতশো টাকা দিয়ে কেনা হল এই মলাট-ছেঁড়া বইয়ের মতো বালি-খসা বাড়িটা। আর বাড়িটা নিজের ট্যাঁকের কড়ি খসিয়ে কিনেছে বলেই হয়তো কুঞ্জ দাসের এটার ওপর এত টান!

বছরের পর বছর করে অনেকগুলো বছরই তো পার হল, টানটা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে না। বোধকরি মুখ না দেখানোর প্রতিজ্ঞাটা বজায় আছে বলে, রংটাও অ-বিবর্ণ, উজ্জ্বল।

আগে কখনও কখনও বলত কুঞ্জ, 'মেয়েটাকে ইচ্ছে করলেই বেড়াতে আনতে পারি।'

ঘরের দেওয়াল বলেছে, 'থাক'!

'লোকসান কি?'

'আছে। মিছিমিছি একটা অবোধ শিশুর মনে কৌতূহল জাগিয়ে দেওয়া। পাঁচটা প্রশ্ন তার মনে তোলা।'

'কত বড়োটা হল, দেখবার সাধও হতে পারে, তাই ভেবেই বলা।'

'নাঃ, সে সাধ নেই।'

তা, নেই সে সাধ নিশ্চয়। সাধ থাকলে ওই ধৃষ্ট নির্লজ্জ মেয়েমানুষটা নির্ঘাত নিজে থেকেই বলত, 'কত বড়োটি হল দেখতে সাধ হয়!' তা পারত ও বলতে, ওর অসাধ্য যখন নেই।

সাধ নেই দেখবার, তবু কুঞ্জ দাস তার নাটকের সেই ছেলে-সাজা মেয়েটার ফটোগ্রাফ তুলে তুলে মাঝে মাঝে ওই নোটের গোছার সঙ্গে দরজার বাইরে রেখে যায়।

ঘরের ভিতর থেকে তাচ্ছিল্যের স্বর ভেসে আসে। 'দরকার ছিল না। না দেখে মরছিল না কেউ।'

কুঞ্জ চটে যেত। বলত, 'কেনই বা মরে না? মরবার তো কথা। গর্ভে ধরলেই তার ওপর মায়ার টান—'

'সবই কি আর এক নিয়মে চলে? বিতেষ্টাও থাকতে পারে।'

'হুঁ! অবোধ শিশু, তার ওপর বিতেষ্টা! আর—'

শব্দভেদী বাণ বলে, 'থামা হল কেন? সবটা হয়ে যাক?...আর পাপে বিতেষ্টা ছিল না, অনাচারে বিতেষ্টা ছিল না, এই সব তো?'

কুঞ্জ বলত, 'সেধে সেধে অপমান গায়ে মাখা! কুঞ্জ দাস অত ছোটো কথা কয় না।'

'আমার ঘাট হয়েছে।'

এই তর্কাতর্কি কখনও কখনও বাতাস উত্তপ্ত করে তুলত। কুঞ্জ বলত, 'আর আসব না।'

ঘরের দেওয়াল তখন হেসে উঠত। বলত, 'টাকাটা তাহলে মনিঅর্ডারে আসবে? না কি বন্ধ?'

কুঞ্জ রাগ করে বলত, 'সাধে আর বলেছে বদ মেয়েছেলে!'

চলে যেত গটগটিয়ে। আবার আসত। বরং সেবারে আরও তাড়াতাড়ি আসত। ক্রমশ এই আসাটা চন্দ্র সূর্যের মতো নিশ্চিত নিয়ম হয়ে গেছে। আসবেই কুঞ্জ। নতুন মেডেল পেলে সেটা দরজায় ফেলে দিয়ে বলবে, দেশসুদ্ধ লোক পুজো করে বৈ হেনস্তা করে না। মেডেল কেউ অমনি দেয় না।'

কোনো বই খুব নাম করলে, এসে ওই উল্টোমুখো বসে পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'হাজার হাজার লোক দেখছে, আর অহঙ্কারীদের গরবে মাটিতে পা পড়ে না!'

ঘরের দেওয়াল বলে, 'দেখাটা হবে কেমন করে? আসরের কানাচে হাড়ি বাউরীদের দলে বসে?'

'সে কথা কেউ বলেছে?' কুঞ্জ রেগে ওঠে।

জবাব আসে হাসির সঙ্গে, 'বলবে কেন? যা ঘটবে সেটাই হচ্ছে কথা।'

কুঞ্জ চুপ করে থেকেছে। কুঞ্জ আর কোনো আশ্বাসের কথা খুঁজে পায়নি তখন। তারপর হয়তো কুঞ্জ সহসা বলে উঠেছে, 'তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্যিটা কি জীবনভোর পালতে হবে?'

ঘরের মধ্যে একটা অস্ফুট আওয়াজ যেন চমকে উঠেছে। তারপর আস্তে আস্তে যেন ঘুমন্ত মানুষ কথা বলেছে, 'দেবতার দিব্যি জন্মভোর কেন, জন্ম-জন্মান্তর পালতে হয়।'

'তেত্রিশ কোটি তো আছে ঘেঁচু। মা-কালী এর মধ্যে পড়ে না।'

'পড়ে? মা-কালীকে অগ্রে নিয়ে তেত্রিশ কোটি।'

'দিব্যি দেবার আর বস্তু খুঁজে পেল না! ছ্যাঃ, যেমন বুদ্ধিতে চলল চিরদিন!'

আক্ষেপ, রাগ, অসহিষ্ণুতা এই ছিল সমাপ্তি সঙ্গীত। ক্রমশ সেটাও গেছে। এখন শুধু যেন অন্ধ একটা নেশার অভ্যাস। আসে, উল্টোমুখো হয়ে বসে পা দোলাতে দোলাতে বাতাসকে কথা বলে, পুকুরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসে, একবেলার ভাতটা খায়, তারপর ছাতাটি নিয়ে স্টেশনে গিয়ে টিনের চালার নীচে সারারাত পড়ে থেকে, সকালের গাড়িতে ফেরে।

রাতে থাকার কথা ওঠে না। নানান জায়গায় থাকা, নানান দেশ থেকে বায়না, কত লাইনের গাড়িতে চড়তে হয় দলবল নিয়ে, কিন্তু এই আমতা লাইনটায় কখনও ভুল হয় না।

প্রথমবার ভাত পায়নি। কুঞ্জ যা দোকানের মিষ্টি এনে ধরে দেয় একরাশ, তাই থেকেই সাজিয়ে গুছিয়ে ধরে দেওয়া হয়েছিল কুঞ্জর সামনে। কুঞ্জ রেগে উঠে বলেছিল, 'ভাতের আগে এই এত সব খেতে হবে?'

'ভাত!'

ঘরের মধ্যে থেকে একটা প্রেতাত্মার ছায়া কণ্ঠ বলে উঠেছিল, 'ভাত খাওয়া হবে এখানে?'

'হবে না তো কি এই পিণ্ডিগুলো গিলে রাত কাটাতে হবে? ভাত ছাড়া রাতে আর কিছু খাই কখনও আমি?'

সেই স্বর বলেছিল, 'এখানে আমি ছাড়া আর কে আছে রাঁধবার?'

কুঞ্জ ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, 'ওঃ, তা শরীর বুঝি ভালো নেই? তবে থাক্, তবে থাক্।' কুঞ্জ ওই কণ্ঠস্বরের মধ্যে বোধকরি ভয়ানক একটা ক্লান্তির আভাস পেয়েছিল। কিন্তু সে উত্তরটা পেল উল্টো।

'শরীর খুব ভালো আছে। হাতে খাওয়া হবে কি না সেই কথাই হচ্ছে।'

'ওঃ হাতে খাওয়া!'

কুঞ্জ একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠেছিল, 'ধর্মজ্ঞান! বলি জলটা দিল কে?'

'জলে আর ভাতে অনেক তফাত।'

'কিছু না, কিছু না, কোনো তফাত নেই। খাওয়া নিয়ে কথা।' বলেই কুঞ্জ আরও হেসে ওঠে, 'আর সে ধরতে গেলে তো জাতে উঁচু হয়েই যাওয়া হয়েছে। কুলের মুখুটি মুখুজ্যে কুলীন।'

ভিতরে স্বর এবার সজীব সতেজ, 'আরও একটা কথা আছে। কাশির ব্যামো হয়েছিল—'

'রোগ সারলে আর রুগী কিসের? বেশি কষ্ট না হলে ভাত দুটো চড়ানো হোক।' সেই থেকে ওই একবেলা ভাত, আর তার সঙ্গে এক পাহাড় কথা!

কথা, কথা! কথা কইবার জন্যেই যেন ছুটে আসে কুঞ্জ। অথচ একটা অশরীরী আত্মার সঙ্গে কথা। আর নতুন কথা কিছুই নেই। তবে ইদানীং কুঞ্জর ওই পুষ্যি মেয়েটার বিয়ের কথা নিয়ে কথা চালায় কুঞ্জ। তার সঙ্গে নিজের বুদ্ধির বড়াইও।

'উঁহু, কাপড়-ফাপড় দিইনি এখনও। ওই ঘাগরা পরিয়েই ছেড়ে ছেড়ে রেখেছি। বয়েস ধরা যায় না। তা ছাড়া স্বভাবেও একেবারে বাচ্চা! মায়ের তো কাঠ কবুল প্রতিজ্ঞে 'দেখব না', নইলে মনে হয় নিয়েই চলে আসি। এত বায়না করে! হাত ধরে ঝুলে পড়ে।'

'অত আহ্লাদেপনা কেন?'

'আহ্লাদেপনা আবার কি? একটাও স্নেহ মমতার জায়গা তো থাকবে মানুষের?'

'সম্পর্কটা বেশ ভালোই পেয়েছে।' একটু হাসির শব্দও আসে কথার সঙ্গে।

'সম্পর্ক! সম্পর্ক নিয়ে কে ধুয়ে জল খাচ্ছে? তবে এই আগে থেকে বলে রাখছি, বিয়ে দিয়ে জামাই মেয়ে এনে দেখাবই। তিন সত্যি!'

'পরিচয়টা কী দেওয়া হবে?'

'সে আমি বুঝব।'

আবার আসে—

বলে, 'মনঃস্থির করেছি, তবু এখনও আরও কিছু বাজিয়ে নিতে বাকি। তবে দেরি করব না, ছেলে-বয়স থাকতে থাকতেই দল থেকে সরাতে হবে। অবিশ্যি খুব দুঁদে আছে মেয়েটা, কাউকে পরোয়া করে না, সব ক'টার সঙ্গে ঝগড়া। তাই আমার শান্তি।'

কুঞ্জর পুষ্যি মেয়েটা দুঁদে বলে কুঞ্জর শান্তি! আর কুঞ্জ তার পাত্র ঠিক করে ফেলেছে বলে কুঞ্জর শান্তি! তবু পাত্রটাকে এখনও বাজিয়ে নিতে বাকি।

সেই বাজানোর পদ্ধতিটাই ধরে কুঞ্জ। লিলিকে ডেকে ডেকে বলে, 'সারাদিন শুধু হি হি করে বেড়াস কেন? শেলেট পেন্সিলটা নিয়েও বসতে পারসি দু'দণ্ড! বাড়িতে একটা লেখা-পড়া জানা ভদ্র ছেলে রয়েছে, তার কাছেও একটু পড়া বুঝে নিলে হয়। তা নয় কেবল ওই মুখ্যুগুলোর সঙ্গে—'

'বরুণদা পড়াবে আমাকে? তা হলেই হয়েছে!' লিলি ঠোঁট উল্টোয়।

কুঞ্জ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

আবার এক সময় অন্য পথ ধরে কুঞ্জ। বলে, 'লিলি, যা দিকি—বরুণকে এক পেয়ালা কড়া করে চা দিয়ে আয় দিকি। রাত জেগে বই লেখে! দেখিস যেন আর কাউকে বরাত দিসনি, নিজে করে দিবি।'

লিলি প্রোপ্রাইটারের কথা ঠেলতে পারে না। কিন্তু খানিক পরে লিলি রাগ করে ফিরে আসে, 'আর কক্‌খনো বরুণদাকে চা করে দেব না। এত বকে!'

'বকে? বকবে কেন?'

'কেন? তোমার ভালো ছেলে ভদ্দর ছেলে যে! চা দিতে গিয়েছি, বলে কি না 'কে তোকে চা নিয়ে আসতে বলেছে? চা খেতে চেয়েছিলাম আমি? খবরদার যদি আর কখনও শুধু শুধু এ ঘরে আসবি তো দেখাব মজা। যা, ফেলে দিগে যা।' লিলি কাঁদো কাঁদো হয় এবার।

কিন্তু কুঞ্জর মুখ হাসি হাসি। কুঞ্জর যেন অঙ্কের ফল মিলে গেছে। কুঞ্জ বলে, 'তুই বললি না কেন, প্রোপ্রাইটার বলেছে।'

'বলতে সময় দিয়েছে? দূর দূর, ছেই-ছেই! শেষকালে যখন বললাম, 'ফেলে দেবে তো—পোপাইটারের সামনে গিয়ে ফেলে দাও গে। যে চা দিতে বলেছে—তখন বলল,—'দে, দিয়ে যা।'

কুঞ্জ মৃদু হেসে বলে, 'রাত-দিন চড়া চড়া পালা লেখে তো? মেজাজটা তাই চড়া।' তার মুখে প্রসন্নতার দীপ্তি।—এই ঠিক ছেলে!

মেয়ে মানুষকে দূর দূর করে মানেই, বিয়ে করা পরিবার ছাড়া জীবনে ও আর কারুর দিকে তাকাবে না। তা ছাড়া লিলির সঙ্গে গেঁথে দিতে পারলে চিরকাল আমার কাছে বাঁধা থাকবে লেখক। আর লিলিও কাছে থাকবে।

কুঞ্জ বরুণের ঘরে এসে ঢোকে।—'চা দেখে রেগে উঠলে কেন গো নাট্যকার? রাত জেগে লেখো, তাই ভাবলাম একটু কড়া করে চা খেলে—'

'না না, আমি ওসব পছন্দ করি না—!' বরুণ বিরক্ত গলায় বলে, 'খুব খারাপ লাগে আমার ওই মেয়ে-ফেয়ে ঘরে ঢোকা।'

কুঞ্জ উদার গলায় বলে, 'আরে বাবা, একটা বাচ্চা মেয়ে—'

'তা হোক!' বরুণ রুক্ষ গলায় বলে, 'বারণ করে দেবেন।'

কুঞ্জ হৃদ্যতার গলায় বলে, 'তা না হয় দিলাম। কিন্তু মেয়েছেলে দেখলেই যদি তোমার এত গা জ্বলে, বে থা করবে কি করে?'

'বিয়ে করব, এ কথা আপনাকে বলতে যাইনি।'

কুঞ্জ হেসে উঠে বলে, 'আহা তুমি তো বলতে যাওনি, কিন্তু আমি তো মনে মনে ঠিক করে রেখেছি তোমাকে ঘর সংসারী করে দেব।'

বরুণ হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলে, 'কেন? হঠাৎ আমার প্রতি এমন নেক নজর কেন?'

'আহা, তুমি রাগ করছ কেন? তোমাকে যে আমার ভারী পছন্দ, তাই!'

'বিয়ের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? পছন্দ করেন, করুন।'

'নাঃ, এখন তোমার মেজাজ ভালো নেই, থাক ও কথা! পালাটার কতদূর হল?'

'এগোচ্ছে।'

'শুনতে পাই না একটু?'

বরুণ একবার এই লোকটার প্রার্থী-প্রার্থী মুখের দিকে তাকায়। এটাও আশ্চর্য! দলের আর সকলের ওপর ব্যবহার তো দেখেছে, যেন হাতে মাথা কাটছে। অথচ বরুণের সামনে যেন বেচারী! যেন কৃতার্থম্মন্য অধস্তন! তার মানে বরুণের মধ্যেকার শিল্প-স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা করে ওই গোঁফওয়ালা

বেঁটে-খাটো লোকটা। বরুণ হঠাৎ নিজের রূঢ়তার জন্য লজ্জিত হয়। বলে, 'আচ্ছা, শুনুন খানিকটা—'

পড়ে কিছুক্ষণ, তারপর মুখে মুখে বাকিটা শোনায়। একজন ভেজালদার কালোবাজারি ঘিয়ে বিষাক্ত চর্বি ভেজাল দিয়ে কেমন করে নিজের পরিবারের সকলের মৃত্যু ডেকে আনল, আর তারপর ভেজালদারের একমাত্র জীবিত কন্যা পদ্মা উন্মাদিনী হয়ে গিয়ে কীভাবে জ্বলন্ত ভাষায় জগতের সমস্ত লোভী মুনাফাখোর আর ভেজালদারদের উদ্দেশে অভিসম্পাত দিয়ে বেড়াতে লাগল, এ তারই কাহিনি।

আধুনিক কোনো 'একাঙ্কিকা নাটিকা'র নাট্যকার বরুণের নাটককে কানাকড়িও মূল্য দেবে কিনা সন্দেহ। বরং হয়তো তার মোটা আদর্শ, আর তার মোটা প্রকাশভঙ্গি দেখে কৌতুকের হাসি হাসবে, তবু বরুণরাও একেবারে অসার্থক নয়। তাদেরও গুণগ্রাহী আছে, তাদেরও শ্রোতা আছে, দর্শক আছে।...সূক্ষ্ম রসের সমজদারই বরং কম। এই মোটা রসের মানুষই তো দেশজুড়ে। দেশ যতই তার সাহিত্য আর শিল্পের উৎকর্ষের বড়াই করুক, আজও নাটকান্তে নায়িকাকে পাগলিনী করে ছেড়ে দিয়ে তার মুখের অসংলগ্ন ভাষার মধ্যেই নাট্যকারেরও মূল বক্তব্যটি চালিয়ে দেওয়ার যুগ প্রায় অবিচলই আছে।

কাজেই কুঞ্জ অধিকারী বরুণের মুখে নাট্যকাহিনি শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়, আর কল্পিত এক আসরে বসে হাজার হাজার করতালির ধ্বনি শুনতে পায়।

হঠাৎ তাই বরুণের হাতটা চেপে ধরে কুঞ্জ বলে, 'এইটাই তুমি ভালো করে খাড়া করে ফেল লেখক! কলকাতার পুরনো রাজবাড়ির যাত্রা 'অপেরা' কম্পিটিশনে এটাই নামাব।'

বরুণ ওই আসায় উদ্‌বেল আগ্রহ-ব্যাকুল মুখের দিকে তাকায়, আর আস্তে আস্তে হাসে। বলে, 'সবটা করে দেখি কেমন দাঁড়াবে।'

'তোমার হাতে আবার কেমন দাঁড়াবে! অপূর্বই দাঁড়াবে।' কুঞ্জ ওর হাতটা আরও জোরে চেপে ধরে বলে, 'নাট্যকার, তুমি কখনও আমায় ছেড়ে যেও না।'

বরুণের মুখে আসছিল, 'স্রোতের শ্যাওলা কি কখনও এক জায়গায় আটকে থাকে?' কিন্তু বলতে পারল না। ওই বয়স্ক লোকটার নির্ভরতায় ভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। তারপর লেখা কাগজগুলোয় মন দিল।

একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে কুঞ্জ উঠে গেল। কুঞ্জ একা পায়চারি করতে করতে ওই জ্বলন্ত ভাষা আর চারুহাসিনীকে মনে করতে থাকে।

পারবে কি? পারবে বোধহয়! কলকাতার পুরানো রাজবাড়ি থেকে ঘোষণাটা একবার পেলে হয়।

কিন্তু হল একটা ব্যাপার।

কলকাতার ডাক আসবার আগেই মহিষাদল থেকে একটা ডাক আসে। জমিদারি না থাক জমিদার-বাড়ি। এখনও পুরানো ঐতিহ্য রয়ে গেছে। একমাত্র ছেলের পৈতে, সেই উপলক্ষে বিরাট ঘটা আর সেই ঘটনা উপলক্ষে যাত্রা আর কবিগান দেবেন তাঁরা। দুর্গাপুজো মারফত কুঞ্জ অধিকারীর পালার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে, তাই তাকেই খবর পাঠিয়েছেন।

কুঞ্জ বলে, 'আমি বলি কি নাট্যকার, তোমার ওই নতুন পালাটাই লাগিয়ে দিই।'

বরুণ বিস্মিত হয়। বলে, 'রিহার্সালের সময় কোথা?'

'হবে, হয়ে যাবে।' কুঞ্জ আগ্রহের গলায় বলে, 'পিটিয়ে পিটিয়ে করে তুলব। মেদ্‌নীপুরের লোকের তোমার গিয়ে এই সব চেতনা বেশি। সেখানে তোমার এ পালা নামালে দেখবে কাণ্ড!'

বরুণ হাসে, 'দেখুন!'

কুঞ্জ কিন্তু হাসে না। কুঞ্জ সিরিয়াস গলায় বলে, 'দেখব না, দেখেছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক নাট্যকার, কোনো বাধাকেই ভয় করি না।'

বলে বটে। অথচ ভাবে বরুণ তার কে? বরুণ তার নাটকের নাট্যকার, এইমাত্র। বলতে গেলে পথে কুড়োনো। আর বলতে গেলে কুঞ্জরই গঠিত বিগ্রহ।—

কোথায় যেন দল নিয়ে চলেছে কুঞ্জ, হঠাৎ রুক্ষুমাথা, ধুলোভর্তি পায়, আধময়লা ধুতি শার্ট পরা ছেলেটা রেলগাড়িতে উঠে পড়ে বলে, 'পয়সা নেই, বিনাটিকিটে উঠেছি, আমার ভাড়াটা দিয়ে দিন না।'

চমৎকৃত কুঞ্জ 'চমৎকার' ভাবটা গোপন করে বলে, 'তা খামোকা আমি তোমার রেলভাড়াটা দিয়ে দেব কেন হে বাপু? তুমি আমার কে, বাপের ঠাকুর চোদ্দপুরুষ?'

ছেলেটা দমেনি। বলেছিল, 'এরাই বা আপনার কে? এই যে দলবল নিয়ে যাচ্ছেন?'

'এরা? এরা তো আমার দল। 'ভবানী অপেরা'র নাম শুনেছ? আমি হচ্ছি তার প্রোপ্রাইটার কুঞ্জবিহারী দাস।'

ছেলেটা বলেছিল, 'নাম শুনিনি, এই শুনলাম। তা বেশ তো, আমাকেও দলের লোক করে নিন।'

চাইছে, অথচ প্রার্থীর ভাব নেই, যেন দাবির সুর। কুঞ্জর ভালো লেগে গেল। হাত কচলানো কৃপাপ্রার্থী দেখে দেখে অরুচি। আর তা না হল তো তেজে মটমট! এর ভাব আলাদা! কুঞ্জ সকৌতুকে বলল, 'তা দলে না হয় নিলাম। কিন্তু তোমার কি গুণ আছে শুনি?'

ছেলেটা বলল, 'গুণ কিছু নেই, তবে যাত্রা-নাটকের পালা লিখতে পারি কিছু কিছু।'

পালা লিখতে পারে! আহা-হা, এই লোকই তো খুঁজে বেড়াচ্ছে কুঞ্জ—যার ক্ষমতা আছে, অথচ আত্মঅহমিকাবোধ নেই। এর নেই, দেখেই বুঝেছে কুঞ্জ। নিজের গুণ সম্পর্কে যেন তাচ্ছিল্য ভাব! ব্যস্ সেই রেলগাড়িতেই হয়ে গেল সম্পর্ক স্থাপন।

তারপর—কুঞ্জর উৎসাহ, প্রেরণা আর বরুণের সহজাত ক্ষমতা। কুঞ্জ অবশ্য বলে, 'লেখাপড়া জানা ভদ্দর।' কিন্তু বরুণ নিজে কোনোদিন নিজের পরিচয় দেয়নি। বলে, 'মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো রাস্তার ছেলে! ব্যস্। এই হচ্ছে আমার পরিচয়।'

তবু কোথায় যেন দূরত্ব আছে। আছে অভিজাত্য। কুঞ্জ তাকে 'বশ করে কেনবার' সংকল্প নিয়ে নিজেই বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছে। কুঞ্জ তার মহিমায় বিবশ। কুঞ্জ দলের আর সকলের উপর রাজা, বরুণের কাছে প্রজা, তাই বরুণ থাকলে সে আর কিছু ভাবে না।

মহিষাদলে যাবার তোড়জোড় চলে, আর চলে জোর মহলা। কয়েকদিনের মধ্যে তৈরি করতে হবে।

হঠাৎ এই মোক্ষম সময়, যখন আর দিনতিনেক দেরি, চারুহাসিনী পড়ল জ্বরে। রীতিমতো জ্বর। যে চারুহাসিনীর ভূমিকা উন্মাদিনী নায়িকার।

কুঞ্জ নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকে গুঁড়ো করতে যায়। কুঞ্জ বুকে কিল মারতে যায়। এখন কী করবে সে? নববালা? বাসমতী? ছি ছি!

হঠাৎ বরুণ বলে বসল, 'ভাবছেন কেন অত? আপনার লিলিকে নামিয়ে দিন না।'

লিলি! কুঞ্জ দাস হকচকিয়ে বলে, 'সে কী!'

'কেন, অবাক হবার কি আছে?' বরুণ অবহেলাভরে বলে, 'রিহার্সাল শুনে শুনে তো ওর মুখস্ত। যখন তখনই তো আওড়ায়। গানও তোলে।'

ইদানীং আর অনেকদিন কমবয়সী ছেলের পার্টের দরকার হয়নি। তাই লিলির কথাটা যেন ভুলেই গিয়েছিল প্রোপ্রাইটার। লিলি শুধু কোমরে বেল্ট বেঁধে সেই কোমরে হাত দিয়ে দলের ওপর সর্দারি করে বেড়ায়।

কুঞ্জ সে খোঁজ রাখে না, তাই কুঞ্জ অগ্রাহ্যের হাসি হেসে বলে, 'মুখস্ত হলেই তো হল না হে! মানবে কেন? ওটা হল একটা যুবতী মেয়ের পার্ট।'

বরুণ অন্যদিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে, 'আপনার লিলিকে তাতে বেমানান হবে না। ঘাগরা ছাড়িয়ে শাড়ি পরিয়ে দেখুন গিয়ে।'

কুঞ্জ তথাপি হাসে, 'আহা, গড়নটা একটু বাড়ন্ত, তা বলে কি বয়েসের ভাবটা আনতে পারবে?'

বরুণ তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'পারে কি না, আসরে নামিয়ে দিয়ে দেখুন। বয়েস আর ছোটো নেই ওর।'

বরুণের মুখে আরও আসছিল—বলে 'আর ওই নিমাই কোম্পানির দলে ছেড়ে দিয়ে আড়াল থেকে দেখুন।'

কিন্তু বলে না। ভাবে, আমার কি দরকার! মেয়েটাকে সে ওই পাকামির জন্যেই দেখতে পারে না। তবে অস্বীকার করতে পারে না, মেয়েটার মুখস্থ করার ক্ষমতাটা।

ওরা যে যার পার্ট রিহার্সাল করে, লিলি শুনে শুনে সবাইয়ের পার্ট মুখস্থ করে ফেলে। ভাবভঙ্গি কিছুই বাদ যায় না। গানও তোলে। তবে কুঞ্জ সম্পর্কে সাবধান থাকে। কুঞ্জ বাড়ি থাকলে গলা তোলে না, পাছে বকে। বকবে, এই ধারণাটাই ছিল লিলির।

বরুণের কাছ থেকে লিলির নাম প্রস্তাবে কুঞ্জ খুব একটা আশান্বিত না হলেও, ঈষৎ কৌতূহলাক্রান্ত হয়েই ডেকে পাঠাল লিলিকে। তারপর বলল, 'তুই পার্ট মুখস্থ করিস?'

লিলি ভয় পেল। বলল, 'না তো।'

'না? তবে যে বরুণ বলল! ওকি মিছে কথা বলবার ছেলে?'

লিলি ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'না, মোটেই নয়! আমার নামে তোমার কাছে মিছে মিছে লাগিয়েই তো ও তোমার সুয়ো হয়েছে।'

'এই দেখো। নিন্দে কোথায়? সুখ্যাতি তো! বলছিল, লিলি ঠিক চারুর মতোন পার্ট বলতে পারে। লিলির গানের গলা আছে।'

লিলি সন্দেহের সুরে বলে, 'তুমি বানাচ্ছ।'

'এই দেখো! আমার বানাবার দরকার কি? তবে ভাবলাম চারুর তো জ্বর, কে ওই পদ্মার পার্টটা করবে। বরুণ বলছিল তোর নাকি সব মুখস্থ!'

লিলি এবার পুলকিত হয়। অতএব বলে ওঠে, 'শুনে শুনে মুখস্থ করেছি, বলব?'

কুঞ্জ প্রসন্নমুখে বলে, 'বল।'

লিলি মনশ্চক্ষে আসরের মাঝখানে নিজের শাড়িপরা মূর্তিটাকে দেখতে পায়। যে মূর্তি জ্বলন্ত ভাষায় বলছে, 'পাপ! পাপ! পাপের ভারে জর্জরিত পৃথিবী দুঃহাত তুলে আর্তনাদ করছে...শুনতে পাচ্ছ না তোমরা? ওই পাপ মায়ের বুক থেকে স্নেহ ছিনিয়ে নিচ্ছে, নারীর প্রাণ থেকে ভালোবাসা। আর পুরুষ জাতকে? শয়তানে পরিণত করেছে, নিষ্ঠুর নির্মম লোভী শয়তান! যে শয়তান ধর্ম মানে না, বিবেক মানে না, মানে না লজ্জা ভয়।...এই পাপের একটা পোশাকী নাম আছে, জানো তোমরা? জানোনা? হাঃ হাঃ হাঃ। সে নামটি হচ্ছে সোনা! বুঝলে?...যার পিপাসা রাবণের চিতার মতো শুধু জ্বলছে। নিবৃত্তি নেই।...এত সোনা দিয়ে কি করবে গো? খাবে? বিছানা পেতে শোবে? হাঃ হাঃ হাঃ। মরণকালে কিসে করে নিয়ে যাবে? লোহার সিন্দুকে?:..'

পাগলিনীর সুর, পাগলিনীর ভঙ্গি। চোখে-মুখে কায়দা! কুঞ্জও পাগল হয়ে ওঠে। উদ্‌ভ্রান্তের মতোন বলে, 'শাড়ি নিয়ে আয় একটা, মাটিতে আঁচল দুলিয়ে পর, চুলের দড়ি খুলে ফেল।'

'তোমার তেত্রিশ কোটির দিব্যিটা একদিনের জন্যে বাতিল করবে?'

উত্তেজিত কুঞ্জ দাস ঘরের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলে, 'এ শুধু হতভাগা কুঞ্জ দাসের মেডেল নয়, তোমার লিলির মেডেল! আসরে নেমেই বাজিমাৎ! ফার্স্ট নাইটের মেডেল! বাড়ির কর্তা একটা দিল, আর মহারাজ গর্গ বাহাদুর একটা। কী হাততালির ঘটা! আসর ফেটে যায় একেবারে! হাজার হাজার দর্শক লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছিল। তখনি পাশের গাঁয়ে আরও একটা বায়না হয়ে গেল।'

ঘর থেকে সাড়া নেই। ঘর নিঃশব্দ! কুঞ্জ দাস গলা চড়ায় 'কথাগুলো কানে গেল না বুঝি? স্বভাবটি চিরকাল এক রইল। দেমাকীর রাজা! বলি মেডেলটা দেখা হবে? না কি তাতেও অগ্রাহ্যি?... তিন বছরের শিশুটাকে চোখ ছাড়া করে রেখে দিয়েছিলে, সে আজ মেডেল লুটে এনেছে, হাজার হাজার লোকের ধন্যি ধন্যি কুড়িয়েছে, এতেও নিয়ম ভেঙে একবার উঁকি দেওয়া যায় না?'

এবার ঘরের মধ্যে থেকে স্বর আসে। শীতল কঠিন।

'মেডেলটা লুটেছে তো আসরে নেচে কুঁদে?'

হঠাৎ কুঞ্জ দাস যেন মাথায় একটা লাঠির ঘা খায়। লিলির ওই অভাবনীয় সাফল্যে কুঞ্জ যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, কুঞ্জ বুঝি নিজের নীতিও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। কম বয়েসে বিয়ে দিয়ে যাত্রার দল ছাড়া করে ঘরগেরস্থী করে দেবে লিলিকে, এই সংকল্পটার কথা মনেও ছিল না আর!

কুঞ্জ আজ ক'দিন ধরে স্বপ্ন দেখছিল, আলোকোজ্জ্বল আসরে লিলি! আসর ফাটাচ্ছে, হাততালি কুড়োচ্ছে, মেডেল লুঠছে...! বারবার, বহুবার। অজস্র জায়গায়। অজস্র আসরে।

কুঞ্জ স্বপ্ন দেখছে, কলকাতার যাত্রা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে কুঞ্জর 'ভবানী অপেরা পার্টি' থিয়েটারের মালিকরা এসে চুপি চুপি ধরনা দিচ্ছে মেয়েটাকে ভাঙিয়ে নেবার জন্যে।....আর কুঞ্জ সগর্ব হাস্যে বলছে, 'আজ্ঞে না বাবুমশায়, ও আমার মেয়ে, নিজের মেয়ে। ওকে আমি—'

আর কুঞ্জ স্বপ্ন দেখছে, চারুহাসিনীকে আর তোয়াজ করতে হচ্ছে না, বার বার রিহার্সাল দেওয়াতে হচ্ছে না।

কুঞ্জর ঘরের মধ্যে এমন দামি রত্ন ছিল, আর কুঞ্জ তার খবর রাখত না? কুঞ্জ নিজেকে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ভাবছিল।....আর ভাবছিল, এই ভয়ঙ্কর আহ্লাদের ঢেউতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অন্তরালবর্তিনীর তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা।

দু'জনে পাশাপাশি বসে দেখবে লিলির মেডেল। সত্যিকারের মা বাপের মতো। কুঞ্জ যে ওর কেউ নয় বলতে গেলে শত্রুপক্ষ, তা তো কুঞ্জর মনে নেই। নিঃসন্তান কুঞ্জর অপত্য স্নেহটা ওইখানে গিয়েই পড়েছে।

তবু কুঞ্জ যেন ঠিক ভোগ করতে পায় না। সন্তানকে সন্তানের মায়ের সঙ্গে না দেখলে কি সত্যকার আস্বাদ পাওয়া যায়? সেই আস্বাদ পেতে ছুটে এসেছিল কুঞ্জ! আগ্রহের মন নিয়ে। সেই মনে লাঠি খেল।

পাথরের দেওয়াল বলে উঠল, 'মেডেল তো আসবে নেচে কুঁদে?'

কুঞ্জ ওই লাঠির ঘায়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপর কুঞ্জর নিজস্ব স্বভাব ফিরে এল। চড়া গলায় বলে উঠল, 'কুঞ্জ অধিকারী তোমার মেয়েকে বাইজীর নাচে নাচায়নি।'

ভিতরের গলা সমান ঠাণ্ডা। 'মেয়ে আমার নয়, মেয়ে অধিকারীরই। তবে গোড়া থেকে শুনেছি কি না অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে ঘরগেরস্থী করে দেওয়া হবে—'

কুঞ্জ সক্রোধে বলে, 'তা সেটা হবে না, কে বলল? নিরুপায়ে পড়ে একদিন নামিয়ে দিলাম, মেয়ের এমন ক্ষ্যামতা যে তাতেই ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল, মেডেল চলে এল, সেই কথাই আহ্লাদ করে বলতে এসেছিলাম। ওকে কি আমি দলে ভর্তি করে ফেলেছি?'

'আর করতে হবে না, ও নিজেই হবে।'

'নিজেই হবে!'

'হবে। 'বাহবা'র নেশা মদের নেশার বাড়া। উচ্ছন্ন দিতে সময় নেয় না।'

কুঞ্জ উত্তর খুঁজে পায় না। তাই কুঞ্জ হঠাৎ একটা বেআন্দাজী চড়া কথা বলে বসে, কড়া আর চড়া বিদ্রূপের গলায়, 'তাই নাকি? কিন্তু ওর মায়ের তো এত 'বাহবা' জোটেনি, তবু উচ্ছন্ন যেতেও আটকায়নি।' বলে ফেলে কুঞ্জ নিজেই থতোমতো খেয়ে যায়। একথা বলার ইচ্ছে তো তার ছিল না।

কিন্তু কুঞ্জকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এটা হাসি শোনা যায়। সত্যিকার খোলা গলার হাসি। তার সঙ্গে কথা, 'কে বললে 'বাহবা' জোটেনি? বাহবা না জুটলে উচ্ছন্নে যাবার পথটা পরিষ্কার হল কিসে?'

'বাহবা! হুঁ! বাহবাটা কিসের?'

'কেন, রূপের!'

রূপের! রূপের! ঝনঝনিয়ে উঠল রক্তকোষগুলো। সে রূপ বহু—বহুকাল দেখেনি কুঞ্জ। যে রূপের প্রতিমাকে হারিয়ে পৃথিবী বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল তার কাছে, আর যে রূপ এই দীর্ঘকাল হতভাগা কুঞ্জ দাসকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সেই রূপের উল্লেখ! সহসা শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে ওঠে কুঞ্জর।

কুঞ্জ সহসা চিৎকার করে বলে ওঠে, 'তা এতই যদি রূপের গরব, সেই রূপ ভাঙিয়ে খেলেই হত! এই গরিব হতভাগাকে বাঁদর নাচাবার দরকারটা কি ছিল?' কুঞ্জ এবার জিভ কামড়ায়, কুঞ্জ নিজের মুখের উপর নিজে থাবড়া মারে। কিন্তু হাতের ঢিল, আর মুখের কথা!

আশ্চর্য, আজই তো সবচেয়ে উৎফুল্ল মন নিয়ে এসেছিল কুঞ্জ। আশাভঙ্গ হল? তা না হয় তাই হয়েছে, তাই বলে কুঞ্জ এমন রূঢ় কথাটা বলবে? তার মানে, ওই মানুষটা ধরে নেবে, এই বিষ মনে পুষে রেখে সরলতার ভান করে নিয়মিত আসা যাওয়া করছে লোকটা, উদারতা দেখিয়ে টাকা দিচ্ছে। কুঞ্জ মরমে মরে যায়।

কিন্তু যাকে ওই বাক্যবাণটি বেঁধা হল, সে মরমে মরেছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেল না। সে দিব্য স্বচ্ছন্দে জবাব দিল, 'মরতে বসেছিলাম যে! এখন তো সে পথ বন্ধ!'

'ওঃ! ওঃ! কুঞ্জর আবার সর্বশরীরে আগুনের হল্কা ছুঁয়ে যায়। সমস্ত স্থৈর্য হারায়। কুঞ্জর সত্যিই মনে হয়, এই দীর্ঘকাল ধরে সে যেন একটা বদ মেয়েমানুষের হাতের সুতোর তালে বাঁদর নাচ নাচছে। এখন সে হি হি করে বলছে—'মরতে বসেছিলাম! উপায় ছিল না।...তাই তোমার মতোন বোকা গাধাটার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। না হলে....ভাঙাতাম রূপ! বিধাতার দেওয়া ব্যাঙ্ক নোট!'

এরপরও কুঞ্জ স্থৈর্য হারাবে না? কুঞ্জ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'ওঃ তাই! তাই—পাখিজুখি খাই না আমি ধম্মে দিয়েছি মন!' আর আমি শালা একটা লক্ষ্মীছাড়া বদ মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে—আবার ঢং কত! 'মেয়ে আমার আসরে নেচেছে, বাইজী হয়ে গেছে!' ঠিক আছে, ও মেয়ে আর আমি রাখছি না। যার মেয়ে তার কাছে দিয়ে যাব, ব্যস! এই আমার সাফ্ কথা!'

কুঞ্জ দালানের ধার থেকে ছাতাটা তুলে নেয়। ভিতর থেকে ঈষৎ ব্যস্ত গলা শোনা যায়, 'তা ঝগড়াটা তোলা থাক না এখন, হাতমুখ ধোওয়া হোক!'

'হাতমুখ ধোওয়া?' কুঞ্জ ছিটকে ওঠে, 'আবার এখানে জলগ্রহণ করব আমি?...ভেবেছিলাম অনুতাপে নাকি সব পাপ ধুয়ে যায়। তবে কেন আর...যাক্, ভালো শিক্ষাই হল। এই যাচ্ছি, কাল-পরশু এসে মেয়েকে ফেলে দিয়ে যাব, ব্যস!'

কুঞ্জ ছাতাটা নিয়ে গট্ গট্ করে চলে যায়। বৃষ্টি পড়ছিল ঝির-ঝিরিয়ে, তবু ছাতাটা হাতেই থাকে।

আজ আর স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে না, এখনও ট্রেন আছে। কুঞ্জ তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে বসে। আর অবাক হয়ে ভাবে, কী করতে এসেছিলাম আমি, আর কী করে গেলাম!...আচ্ছা, কী কী

বললাম আমি।...মনে করতে পারল না, শুধু নিজের উপর অপরিসীম ধিক্কারে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। অথচ একটানা অনেকদূর যাবার পথ নয়, দেহটাকে নিয়ে বহু টানা-হেঁচড়া করে তবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবে। দল এখনও মহিষাদলে পড়ে। এই টানা-হেঁচড়া করেই এসেছিল, তখন গায়েও লাগেনি, এখন যেন আর দেহ চলছে না।

আশ্চর্য এতদিন ধরে কী করেছে কুঞ্জ? কুঞ্জ কি পাগল হয়ে গিয়েছিল? নাকি কুঞ্জকে কেউ মন্ত্র প্রয়োগ করে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল? নইলে কুঞ্জ তার কুলত্যাগিনী স্ত্রীর একটা 'তু' ডাক পেয়ে ছুটে গিয়ে তার বিপদে বুক দিয়ে পড়তে গেল?

বিপদ কি, না তার সেই পাপের সঙ্গীর মৃত্যু! কুঞ্জ তো তখন তীব্র ব্যঙ্গের হাসি হেসে আঙুল তুলে বলতে পারত, 'ঠিক হয়েছে! বোঝো—পাপের ফল!' পারত, অথচ কুঞ্জ তা করল না।

কুঞ্জ সযত্নে তার সেই পরম শত্রুর শেষকৃত্য করল, কুঞ্জ তার কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে 'মরতে বসা' থেকে রক্ষে করল, আর তার একটা অবৈধ দায়িত্ব ঘাড়ে করল।

কুঞ্জ নিজেকে প্রশ্ন করে, কিসের লোভে এসব তুই করেছিলি হতভাগা? কিসের প্রত্যাশায়? কিছু না। তবে? নিশ্চয় ওই মেয়েমানুষটার গুণ-তুকের ফল। নইলে ওই তুচ্ছ একটা মেয়েমানুষকে এত ভয়ই বা কেন তার? তাই কিছুতেই সাহস সংগ্রহ করে একবার ঘরে ঢুকে পড়তে পারে না। বলতে পারে না, দেখি—সত্যিই তুমি সেই উমা কিনা!

আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত ওর মুখ দেখল না কুঞ্জ, অথচ মাস মাস মাসোহারা ধরে দিয়ে যাচ্ছে! আর সেও দিব্যি অম্লান বদনে নিয়ে চলেছে। ভালো মেয়ে হলে নিতে লজ্জা হত না? সেই, সেই কথাই ভাবা উচিত ছিল কুঞ্জর। আর ঠাট্টা করা উচিত ছিল, মুখ দেখাতে লজ্জা তোমার, অথচ মুখে হাত তোলার খরচাটি নিতে তো লজ্জা নেই?

কিছু বলতে পারেনি কুঞ্জ। শুধু গাধার মতো গিয়েছে, আর টাকাটি দিয়ে চলে এসেছে। যেন তিনি নিলেই কৃতার্থ! যত ভাবে ততই যেন নিজেকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে কুঞ্জর। 'চৈতন্য হবার' যে এত যন্ত্রণা, তা জানত না কুঞ্জ।

কুঞ্জ ওই লিলিকে দিয়ে যাবে, ব্যস্!

ভাবনার খেই ছেড়ে কুঞ্জকে গাড়ি বদল করতে হয়। এরপর আবার দু'বার বাস বদল করতে হবে কুঞ্জকে।

আসর থেকে ফিরে আসতেই কুঞ্জ লিলিকে প্রায় কোলে করে নেচেছিল। দলের সবাই অভিনন্দন জানিয়েছিল।...এমন কি নাক-উঁচু বরুণও হঠাৎ ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিল, 'তোর উন্নতি হবে।'

শুধু বাসমতী আর নববালা মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, 'ওসব মেডেল হচ্ছে রূপের, আর হাততালি হচ্ছে বয়েসের!'

কিন্তু সে তো বলেছিল আড়ালে। লিলি যেন আহ্লাদে, গর্বে, বিস্ময়ে, বৈকল্যে কেমনধারা হয়ে গিয়েছিল! এ যেন লিলি স্বপ্ন দেখছে।

লিলির মধ্যে এত ক্ষমতা ছিল! লিলির মধ্যে এমন আশ্চর্য শক্তি! ভাগ্যিস চারুর জ্বর হয়েছিল!

অভিভূত ভাবটা কাটলে লিলি হঠাৎ অন্য দিক দিয়ে ভাবতে শুরু করল। আর তখন লিলির মনে হল, ওই অধিকারী তার পরম শত্রু। কাউকে বুঝতে দিচ্ছিল না। এমন কি কুঞ্জকেও না। ছেলেবেলায় ধুতি পরিয়ে পরিয়ে বেটাছেলে সাজাত, বড়ো হয়ে অবধি আর সাজতেই দেয় না। শুধু খুকি সাজিয়ে রেখে দেয়। আবার বিয়ের জন্য ব্যস্ত।

তার মানে লিলির এই মস্ত গুণটাকে ফুটতে না দেবার ইচ্ছে। তবে? শত্রু ছাড়া আর কি?

নেহাত চারুহাসিনী জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, তাই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে! তাও সেই একদিনের জন্যেই।

আগে থেকেই গাওনা হচ্ছে—'একটা দিন করে দে, ভয় খাসনে। ভয় কি?'

মুখের সামনে হাত-আয়না ধরে অনেকক্ষণ নিজের মুখটা দেখল লিলি। তারপর পনেরো বছরের লিলি ভাবল, এত রূপ গুণ থাকতে আমি কেন বেচারীর মতো পড়ে থাকব? পোপাইটার যেন দয়া করে রেখেছে। দয়ার কি ধার ধারি?

এই তো নিজগুণেই বাজার মাৎ করে ফেললাম। ওই লেখক মুখপোড়া তো দু'চক্ষের বিষ দেখে আমায়, কিন্তু যেই আমার নাম-যশ হয়েছে, অমনি সেধে সেধে গায়ে পড়তে এসেছে।

হাসিতে পেট ফুলে উঠল।....আসবে, সবাই আসবে।—ভালো ভালো পার্টি লুফে নিতে চাইবে। সেখানে কত মান, কত যশ, কত টাকা! এই তো চারুহাসিনীর কত মাইনে! লিলির আরও বেশি হবে, কারণ লিলির রূপ আছে।

কিন্তু এই স্বার্থপর কুঞ্জ দাসের কাছে পড়ে থাকলে? একটি পয়সাও না। এই তো আগে কত পার্ট করেছে। হোক গে ছেলের পার্ট, হোক গে একটুখানি, তবু পার্ট তো? কই তার দরুণ দিয়েছে একটা পয়সাও লিলিকে? দেবে কে? লিলি যে তাঁর কেনা! কেন? তিন বছরের একটা মেয়েকে পুষে তার মাথাটা জন্মের মতো কিনে নিয়েছেন! স্বার্থপর! বেহায়া! কুটিল!

লিলি আর এই স্বার্থপরতা সহ্য করতে পারবে না। লিলি পথ দেখবে। লিলি সেই পথ দেখার চেষ্টায় নিমাইকে ধরে পড়ে। বলে, 'নিমাইদা, কলকাতার রাজবাড়িতে আর দরকার নেই, চল—ভেগে পড়ি এইবেলা।'

নিমাই পাকা-চোকা ছেলে। নিমাই ওর হাত ধরে বলে, 'কী সাজই সেজেছিলি, বাস্তবিক মনে হচ্ছিল পরী!'

বাচ্চা লিলি চোখমুখ ঘুরিয়ে বলে, 'আহা, সাজ তো কত! পাগলিনী!'

'ওতেই তো আসরসুদ্ধ লোককে পাগল করে দিয়েছিলি বাবা! যে করে গিলছিল সবাই, মনে হচ্ছিল আমার জন্যে আর কিছু রাখবে না।'

'ভাগ্ ছোটোলোক!' লিলি বাসমতীদের মতো ভঙ্গি করে।

তারপর ওরা বিচার করে সিদ্ধান্ত করে, এত গুণ নিয়ে এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। এখানে প্রাণপাত করেও বড়োজোর দু'খানা মেডেল, আর দুটো তোয়াজী কথা! তার বেশি নয়। তাছাড়া 'ভবানী অপেরা'র পালার বহরে তো শুধু ওই, পাগলিনী সাজ! 'লাভ' নেই, রস নেই, সাজাগোছা নেই। অথচ অন্য অন্য পার্টিতে? রানি সাজো, মহারানি সাজো, প্রেমিকা সাজো। যাত্রার আসরের প্রেমিকা আর রানি মহারানি ছাড়া আর অন্য কিছুই ভাবতে পারে না লিলি নিজেকে।

অতএব ঠিক হল, নিমাই আর লিলি নিজেরাই একটা দল খুলবে। ব্রজটাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, লোকটা অধিকারীকে মোটেই দেখতে পারে না। বলা যায় না, জগাও যেতে পারে। অধিকারী বলবে অকৃতজ্ঞ? বললে তো বড়ো বয়েই গেল।—নিজে যে এতো স্বার্থপর?

বিবেকমুক্ত হল লিলি। নিমাই তো হয়েই ছিল।

কলকাতার 'কম্পিটিশান' পর্যন্ত আর ধৈর্য ধরছে না তাদের। তাছাড়া—লিলি বায়না ধরেছে আগে তাদের বিয়েটা সারা হয়ে যাক, তারপর যা হয় হবে।

প্রথমটা অবশ্য নিমাই বলেছিল, 'বিয়ে করলে তো বৌ হয়ে গেলি। ঘরের বৌকে কি আমি আসরে নাচাব?'

লিলি রেগে উঠে বলেছিল, 'তবে বিয়েটা কার সঙ্গে হবে শুনি? না কি হবেই না? তবে আমি তোমার সঙ্গে যাবই না।'

অতএব বিয়ে। কালীঘাটে গিয়ে সিঁদুর নেওয়া। সে জানে, ব্রজ সব রকম সাহায্য করবে।

রাত্তিরে আর ফেরা সম্ভব হল না। রাতটা হাওড়া স্টেশনে খেয়ে আর শুয়ে সকালের গাড়িটা ধরল কুঞ্জ—মেদিনীপুরের। পাঁশকুড়া থেকে বাসে তমলুক, তমলুক থেকে মহিষাদল।

রাত্রে খেয়ে আর শুয়ে হঠাৎ আশ্চর্যভাবে চিন্তার ধারাটা ঘুরে গেল কুঞ্জর। সমস্ত রাগ ঘৃণা ধিক্কার ঝাপসা হয়ে গিয়ে ভয়ানক একটা লজ্জায় যেন ঝুলে পড়ল কুঞ্জ। কী করে এসেছে সে! মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে এসেছে! ভুল মানুষেরই হয়, ওরও হয়েছিল, কিন্তু সেই ভুলের খেসারতও দিতে হয়েছে কম নয়!

কুলত্যাগ করে চলে গিয়েও বিপদে পড়ে যে তার স্বামীকে মনে পড়েছিল, এতে কি বোঝায়? অথচ আজ কুঞ্জ সেই বিশ্বস্ত প্রাণটাকে পায়ে মাড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়ে এল!

কুঞ্জ টাকার খোঁটা দিল। ছি ছি! এত নীচ কি করে হল কুঞ্জ? যদি এই ধিক্কারে 'ও টাকায় খেয়ে আর বেঁচে দরকার নেই' ভেবে আত্মঘাতী হয় উমা? হতে পারে। চিরকালের অভিমানিনী। মরবেই হয়তো। তাহলে বলতেই হবে, কুঞ্জ লোকটা খুনী! একটা মানুষের মৃত্যুর কারণ মানেই খুনী!

এখন কুঞ্জ যত ভাবতে থাকে, তার নিজের দিকের পাল্লাটা ততই অপরাধের ভারে ঝুঁকে পড়ে। মনের অগোচর পাপ নেই, লিলির সেদিনের সাফল্যে কুঞ্জ পূর্বের সমস্ত সংকল্প বিসর্জন দিয়ে ভাবেনি কি, বরাবরের মতো নায়িকার অভাব মিটিল কুঞ্জর? আর চারু ফারুর তোয়াজ করতে হবে না।...তার মানেই উমা যা বলেছে তাই।

ওকে সময়ে বিয়ে দিয়ে সংসারী করার ইচ্ছেটা আমার ছল। যেই স্বার্থের গন্ধ পেয়েছি সেই ছল উড়ে গেছে।

হঠাৎ একটা অসমসাহসিক প্রতিজ্ঞা করে বসে কুঞ্জ দাস। হ্যাঁ, দু'একদিন পরেই লিলিকে নিয়ে তার মায়ের কাছে যাবে কুঞ্জ, কিন্তু একা লিলিকে নিয়ে নয়, 'জোড়ে' নিয়ে। দেখিয়ে দেবে উমাকে সবটাই তার ছল ছিল না।—বরুণের কাছে হাতজোড় করে বলবে, 'এই বিয়েটা না হলে একটা লোক আত্মঘাতী হবে। এ তোমাকে করতেই হবে।'

কুঞ্জ যখন পৌঁছল, তখন সকালের সূর্য মধ্যাহ্ন আকাশে। কুঞ্জ বসে পড়ে বলল, 'এক গেলাস জল!'

জল দিল বাসমতী। দু'চক্ষে যাকে দেখতে পারে না কুঞ্জ।

জলটা তক্ষুনি চোঁ-চোঁ করে খেয়ে না নিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'লিলি কোথায়?'

বাসমতী খনখনে গলায় বলে উঠল, 'সেই সকালে উঠে কোথায় কি কালীঠাকুর আছে, সেখানে নাকি নরবলি হত, তাই দেখতে গেছে।'

কুঞ্জ আঁৎকে ওঠে, 'একলা?'

'একলা কেন?' বাসমতীর গলা আরও খন্‌খনায়, পেরাণের বন্ধু নিমাইদা গেছেন সঙ্গে—'

'থামো, চুপ করো।' কুঞ্জ ওর বিরক্ত চিত্তের ভাবটা এটা প্রচণ্ড ধমকের মধ্যে দিয়ে কিছুটা লাঘব করে নিয়ে বলে, 'এলে আগে আমার কাছে আসতে বলবে।'

তারপর কুঞ্জ ও-বাড়ি চলে যায়। যে বাড়িতে বরুণ আছে।

যারা 'ভবানী অপেরা'কে এনেছিল তাদের মেয়াদ মিটে গেছে, তবে পাশের পাড়ায় আর একটা বায়না জুটেছে বলে কুঞ্জর দলকে এরা থাকতে দিয়েছে। কিছু লোককে কাছারি বাড়িতে, কিছু লোককে বসতবাড়ির বৈঠকখানায়। সেই কাছারি বাড়ির দোতলাতে বরুণের স্থিতি। কুঞ্জ সেখানে গিয়ে বসে।

বরুণ হাতের কাজ রেখে বলে, 'মিস্টার দাস এসে গেছেন? কতক্ষণ? স্নানটান হয়নি এখনও?'

কুঞ্জ অগ্রাহ্যভরে বলে, 'নাঃ! মরুকগে স্নান। দুটো কথা শোনার সময় হবে তোমার, বরুণ?'

বরুণ একটু চমকায়।

কুঞ্জ কখনো 'বরুণ' বলে ডাকে না।

তবু বরুণ সে প্রশ্ন তুলল না। শুধু বলল, 'কী আশ্চর্য, সময়ের অভাব কি? বলুন।'

'বরুণ', কুঞ্জ আবেগের গলায় বলে, 'আমার ওই মেয়েটাকে তোমায় নিতে হবে বরুণ!'

এবার বরুণ চমকায়।

আর প্রায় রুক্ষ গলায় বলে ওঠে, 'কী বলছেন?'

'হ্যাঁ, জানি তুমি চমকে উঠবে', কুঞ্জ ওর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'তবু তোমাকে এটি করতেই হবে। নচেৎ একটা মানুষ আত্মঘাতী হবে।'

বরুণ অবাক দৃষ্টিতে তাকায়।...লোকটা কি অসময়ে নেশা-টেশা করে এল নাকি! আস্তে বলে, 'আমি আপনার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কুঞ্জ জেদের গলায় বলে, 'মানে পরে বুঝো, তুমি আগে কথা দাও।'

'তাই কখনও সম্ভব, মিস্টার দাস—আপনিই বলুন?'

'কিন্তু অসম্ভবই বা কিসে বরুণ? লিলি দেখতে বলতে গেলে সুন্দরী, আর ধরে নাও আমার নিজেরই মেয়ে। কাজে কাজেই আমরা সর্বস্বই ওর, মানে তোমার হবে। জীবনের আর কোনো চিন্তা থাকবে না, তুমি শুধু নিজমনে লিখবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে।'

বরুণ হেসে ফেলে। বলে, 'সুখে থাকব কি না জানি না, তবে স্বচ্ছন্দে থাকতে পাব তা ঠিক। এখন যেমন রয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় না-খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আপনি—আপনার সেই দয়ার ঋণ শোধ দেবার নয়। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করি, আপনার সর্বস্ব পণ দিয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে হাতে তুলে দেবার মতো এমন কি দামি পাত্র আমি?'

'দামি! দামি!' কোহিনুর হীরে!' কুঞ্জ আতিশয্য দেখায়, 'চিনেছি বলেই বলছি। মেয়েটাকে বড্ড ভালোবাসি বলেই বলছি বরুণ! তা ছাড়া ও একজনার গচ্ছিত ধন, ওর যদি ভালো ব্যবস্থা না করি, ধর্মের কাছে পতিত হতে হবে আমায়।'

'কিন্তু আমি যদি বলি—' বরুণ দৃঢ় গলায় বলে 'আমার মতো একটা রাস্তার লোক, যার জাত-জন্মের ঠিক আছে কি নেই, তার হাতে তুলে দেওয়াটাও আপনার এমন কিছু ধর্ম হবে না।'

'সে আমার ভাবনা।'

কুঞ্জ আত্মস্থ গলায় বলে, 'জাতের পরিচয় কি তার গায়ে লেখা থাকে লেখক? থাকে তার আচরণে। ওই সনা ব্যাটা তো বামনা। ভট্চায্যি বামুনের ছেলে। ওর আচরণটা ভাবো? মনে হয় চাঁড়াল। আর এই আমি? কায়েতের ঘরের ছেলে, কী আচরণ আমার? ওসব জাত-ফাত ছেড়ে দাও।'

'তা না হয় ছেড়ে দিলাম—' বরুণ কঠিন গলায় বলে, 'কিন্তু জন্ম? সেটা ছাড়তেও আপত্তি নেই আপনার—আমি ভালো পালা লিখতে পারি বলে?'

কুঞ্জ এতক্ষণ ওর হাত ধরে রেখেছিল, এবার আস্তে ছেড়ে দেয়। কুঞ্জর মুখে একটা ঝাপসা রহস্যের হাসি ফুটে ওঠে। কুঞ্জর কপালে শুকিয়ে-ওঠা ঘামের চিহ্নগুলো আবার ফুটে ওঠে। কুঞ্জ কোঁচার খুঁট তুলে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'তবে—তোমাকে একটা কাহিনি শোনাই লেখক, শোনো। হয়তো তোমার একটা নাটকের প্লট হয়ে যাবে।'

বরুণ বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু তারও আগে আপনি স্নান আহার করে নিলে হত না?'

'নাঃ, ওসব আপদ বালাই এখন থাক্ বরুণ, আমার মনের মধ্যে এখন সমুদ্দুর উথলোচ্ছে। এই গল্পটা আগে শোনাই তোমাকে, তারপর বুঝতে পারবে কেন তোমায় অকস্মাৎ অমন কথাটা বলে ফেললাম!'

বরুণ খাতা-পত্র সরিয়ে রেখে বলে, 'বলুন!'

কুঞ্জ তার চেহারার সঙ্গে বেমানান আবেগের গলায় বলে, 'দেশটার নাম করব না, শুধু বলি এক দেশে একটা বাঁদরের গলায় একটা মুক্তোর মালা ছিল। মালাটা জুটেছিল বাঁদরটার ঘরে কিছু পয়সা ছিল বলে। তা হতভাগা বাঁদর বৈ তো নয়? সে ওই রাজার গলার উপযুক্ত মুক্তোর মালার মর্ম বুঝত না, তাকে ঘরে ফেলে রেখে পাড়ায় এক সখের থিয়েটারের দল খুলে সেখানেই রাতদিন পড়ে থাকত। কখনও গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজত, কখনও গোঁফ লাগিয়ে ডাকাত সাজত।

ঘরে ভাত ছিল, তাই পেটের ধান্ধা ছিল না। কিন্তু ওদিকে দরজা-খোলা ঘরে মুক্তোর মালা পড়ে, চোখের দৃষ্টি পড়বে সেটা আশ্চয্যির নয়। বল লেখক, আশ্চয্যি?'

বরুণ মাথা নাড়ে।

হঠাৎ কুঞ্জ সন্দিগ্ধ গলায় বলে, 'গল্পটা তুমি ধরতে পারছ তো, লেখক?'

বরুণ ওর দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বলে, 'পারছি।'

'হ্যাঁ, কি বলছিলাম? সেই চোরের দৃষ্টি, না? তা সেই চোরের দৃষ্টি পড়ার পর যা হয় তাই হল। মুক্তোর মালা হাওয়া হয়ে গেল! বুঝলে নাট্যকার? বাঁদরটা ঘরে এসে দেখে ঘর খালি। তখন বুঝলে, তখন সেই শূন্য ঘর দেখে বাঁদরটা টের পেল তার কী ছিল! তখন বুঝল। কিন্তু তখন আর উপায় কি? হতভাগাটা তখন—'

কুঞ্জর গলাটা বসে আসে। আর সেই বসা গলায় সে এক হতভাগা বাউন্ডুলের কাহিনি বলে চলে, যা পালাকার বরুণের বুঝতে অসুবিধে হয় না।—অসুবিধে হয় না, সে শুধু বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শুনে চলে একটা অবোধ প্রেম-কাহিনি! যে প্রেমিক জানে না সে ভালোবাসছে। যে শুধু ভেবে এসেছে, না করলে চলবে কেন, মানুষ বৈ তো জানোয়ার নয় সে!

আশ্চর্য, অধিকারী কুঞ্জ দাস, রগচটা রূঢ়ভাষী নিতান্ত গ্রাম্য চেহারার এই লোকটা, সে এমন কবিত্বের ভাষা পেল কোথায়? জীবনভোর যাত্রা-গান করে আর দেখে? নাকি এই ঘর-ছাড়া বরুণটা তার এই উন্নতি সাধন করেছে?

ভাবের সন্ধান দিয়েছে, তাই ভাষা এসেছে তার পিছু পিছু! সেই ভাষা আসছে কুঞ্জ অধিকারীর জিভে, 'চোরটা আবার আর এক বাঁদর। বুঝি বাঁদরও নয়, ভাল্লুক। তাই মুক্তোর মালাটা নিয়ে গলায় না পরে তাকে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে মাড়িয়ে নিজে মরল। তারপর—'

বেলা বেড়ে উঠেছে। ও-বাড়ি থেকে বিপিন ব্রজ সনাতন অনেকে এই কাছারি বাড়িতে এসে উঁকি দিয়ে গেছে, দু-দু'বার ডাকের পর তাদের মুখের ওপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে কুঞ্জ। বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বরুণকে বলেছিল, 'তোমার চান আহার হয়েছে তো?'

বরুণ মৃদু হেসেছে। কুঞ্জ সেই হাসিটার অর্থ খুঁজতে বসেনি। কুঞ্জ তার কাহিনির হারিয়ে যাওয়া সূত্র খুঁজতে অতীত হাতড়েছে।

বন্ধ দরজার মধ্যে সেই মৃদু কণ্ঠের কথন, বরুণের চোখে খুলে দিয়েছে একটা বন্ধ দরজার কপাট। সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বরুণ আস্তে বলেছে, 'সেই মেয়ে! আপনি তাকে? আশ্চর্য!'

কুঞ্জ ম্লান হেসে বলে 'ভাবলে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু আরও তলিয়ে ভেবে দেখলে জগতে কিছুই আশ্চর্য নেই, লেখক! সবাই তো মনের ওপর নির্ভর। সেই মনটা দিয়ে তোমাকে আমি পরম বন্ধু ভাবতে পারি, পরম শত্রুও ভাবতে পারি। সেদিন যখন সেই অকস্মাৎ গিয়ে পড়ে আমাদের গ্রামের সেরা বড়োলোক কমল মুখুজ্যের ছেলে অমল মুখুজ্যের মড়াটাকে একটা বস্তির উঠোনে বাঁশের খাটিয়ায় পড়ে থাকতে দেখলাম, হঠাৎ যেন চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা খুলে গেল। দেখলাম জগৎ সংসারের এই লীলাটার যেন কোনো মানেই নেই। যেন একটা হাসির ঘটনা। তোমরা

যেমন হাসির নাটক লেখো, বিধাতাপুরুষ তেমনি একখানা বড়োসড়ো হাসির নাটক লিখে রেখেছেন। পার্টগুলো প্লে করছি আমরা।...মরে গেলাম, ফুরিয়ে গেল—ব্যস।...ওই মেয়েটাকে যদি আমার শত্রুর মেয়ে না ভেবে আমারই মেয়ে ভাবি? হলটা কি? কিছু না। অনেক ল্যাঠা মিটে গেল বরং! আর উমা? তাকে তো মরবে বলেই হাসপাতালে দিয়ে এসেছিলাম। যখন দেখলাম ফিরে এল, তখন আহ্লাদে দিশেহারা হয়ে—'

কুঞ্জ চুপ করে একটু।

বরুণ সেই অবসরে মৃদু হেসে বলে, 'দিশেহারা হয়ে ভাবলেন ছড়ানো মুক্তোগুলো দিয়ে আবার মালা গাঁথি?'

কুঞ্জ ওর দিকে তাকায়। আস্তে বলে, 'তা ঠিক নয়, লেখক! অতটা আশা করিনি, শুধু ভেবেছিলাম—না, কিছুই বোধহয় ভাবিনি। শুধু একটা নেশার অভ্যেসের মতো করে চলেছিলাম। তা কাল তো ভালোই করে এলাম। এখন শুধু ভাবছি তার কাছে মুখ দেখাবার একমাত্র পথ হচ্ছে—'

আগেই কথা হয়ে গেছে। তাই থেমে যায় কুঞ্জ। তারপর বলে, 'জানি না সে সময় মিলবে কি না। হয়তো আত্মঘাতীই হয়ে বসবে—'

বরুণ মাথা নেড়ে বলে, 'না, তা মনে হয় না। যে রকম শুনলাম, সে ধাতুর মেয়ে নয় বলেই মনে হয় তাঁকে।'

'হয়তো তাই হবে। তবে টাকা আর নেবে কি না সন্দেহ! টাকার খোঁটাটা মোক্ষম দিয়ে এসেছি কি না!'

'তাও বলা যায় না, হয়তো নেবেন।'

কুঞ্জ ব্যগ্রভাবে বলে, 'নেবে? তুমি কি করে জানছ বলত?'

'এমন অনুমান! আপনার প্রকৃতি ওঁর জানা। যেমন আমরা একটা বই পড়ে তার সবটা বুঝে ফেলি, প্রায় তেমনি। উনি জানেন আপনার মুখের কথা যাই হোক, ভেতরের ভাবটা কি।'

কুঞ্জ গভীর গলায় বলে, 'এবার বুঝতে পারছ বরুণ, কেন তোমায় সুপাত্র বলে ভাবছি? পালা লেখো বলে নয়। 'মানুষ' বলে। চোখ কান আন্দাজ অনুভব সমেত আস্ত একটা মানুষ বলে। আমার অনুরোধ রাখবে না বরুণ?'

বরুণ মাথা নীচু করে বলে, 'দেখুন, জীবনের ছক কেটেছিলাম অন্য রকম, সে ছক হচ্ছে কোনোখানে স্থিতু হব না, স্নেহের বন্ধনে বাঁধা পড়ব না, ভেসে ভেসে বেড়াব। কিন্তু অজান্তে কখন যে আপনার কাছে বাঁধা পড়ে বসে আছি! শেকড় গজিয়ে গেছে, টেরই পাইনি। এখন হঠাৎ টের পাচ্ছি। কিন্তু লিলি তো আপনার সত্যি মেয়ে নয়? তার মধ্যে অন্য প্রকৃতি, অন্য স্বভাব।'

কুঞ্জ বোঝে বরুণের বাধাটা কোথায়। কিন্তু কুঞ্জ তার সেই একান্ত স্নেহপাত্রীটিকে বোঝে না। তাই কুঞ্জ সান্ত্বনার গলায় বলে, 'তা আমি স্বীকার করছি লেখক, মেয়েটা হালকা স্বভাবের। বয়স পেরায় পনেরো ষোলো হল, তবু জ্ঞান বুদ্ধি হয়নি। তবে হবে। আমি বলছি হবে। ভেতরে বস্তু মাত্র না থাকলে দুটো দিনের রিহার্সালে অমন 'প্লে'খানা করতে পারত না। তোমার লেখা ভাষার মানে বুঝেছে ও, বলছি আমি তোমায়। মানে না বুঝলে—'

বরুণ আস্তে বলে, 'তা বটে!'

'তবে? তবেই বোঝো?' কুঞ্জ আবার সাগ্রহে ওর হাত চেপে ধরে বলে, 'খুকি সেজে বেড়ায়, তাই খুকিপনা করে। আর সর্বদার সঙ্গী তো ওই অকাল কুষ্মাণ্ডগুলো? তোমার হাতে পড়লে দেখো! ভোল বদলে যাবে। মাতৃগুণ বলেও তো একটা জিনিস আছে লেখক?'

বরুণ চুপ করে থাকে।

কুঞ্জ বলে, 'তাহলে কথা দিলে?'

'দিলাম।'

কুঞ্জর এতক্ষণের উত্তেজনা সহসা স্থির হয়ে যায়। কুঞ্জ জামার হাতটা চোখে ঘসে ঘসে চোখের জল মোছে।

তারপর কুঞ্জ মনে মনে ছক কেটে ফেলে। 'ধাড়াবাড়ির' বায়না হচ্ছে সামনের পূর্ণিমায়, হাতে এখনও চার-পাঁচটা দিন। এরমধ্যেই শুভ কাজটা সেরে ফেলে উমার কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর এই বরুণকে দিয়ে হাতজোড় করিয়ে আর একটা 'শো'র জন্যে অনুমতি চাইয়ে নিতে হবে। বায়না করেছে, অগ্রিম টাকা দিয়েছে, দশদিন ধরে এতগুলো লোককে পুষছে, না করলে মহা অধর্ম।....

তাছাড়া বড়োলোকের মেজাজ, হয়তো লিলির বদলে চারুকে দেখলে পুলিশ কেস করতে আসবে। জামাই গিয়ে ধরলে 'না' করতে পারবে না।

ভেঙেপড়া কুঞ্জ একটা মানুষের আশ্বাসবাক্যে আবার যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অবোধ হৃদয়টা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে বসে, জামাই দেখে বিগলিত হয়েছে উমা, পুরনো জেদ বিসর্জন দিয়েছে। মুখ দেখাতেই হাসছে, কথা কইছে, তাদের খাওয়াচ্ছে, আর...হঠাৎ আহ্লাদ করে বলে উঠেছে—'জামাইয়ের লেখা 'পালা', মেয়ের অ্যাক্টো, তবে চল দেখেই আসা যাক।'

কিন্তু কি জানি, কেমন দেখতে হয়েছে এখন সেই মুখ! এই দীর্ঘদিনে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আসতে অবগুণ্ঠনে ঢাকা মানুষটার শুধু হাতের একটুখানি দেখেছে কুঞ্জ। মুখ দেখেনি। জানে না বয়সের ছাপ কতটা পড়েছে তাতে।...

লিলি হকচকিয়ে যাবে। ভাববে 'মা আছে আমার, জন্মে জানতাম না সেকথা, হঠাৎ এই পরীর মতো মা!' হঠাৎ 'পরী' শব্দটাই মনে আসে কুঞ্জর, 'দেবী' নয়। অথচ সেটাই হলে ভালো হত।... হয়তো কুঞ্জর এই বিশেষণটা পূর্বস্মৃতির উপর নির্ভরশীল।

কুঞ্জ তাই ভাবে—ওই পরীর মতো মাকে দেখে আহ্লাদে হয়তো মূর্ছা যাবে ছুঁড়ি।...

আর কুঞ্জ এই ভেবে মূর্ছাহত হয়, আলোকোজ্জ্বল আসরে সামনে এসে বসেছে নায়িকার মা। তার গৌরব কত! কিন্তু ওর বেশভূষাটা কেমন?

সধবার মতো তো? না কি বিধবার মতো? অমল মুখুজ্যে মরেছে বলে কি লোক দেখিয়ে বিধবা সাজতে হয়েছিল বামুন বৌকে, সর্বাঙ্গে চাদরমুড়ি দিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল, এসেছিল, রেলগাড়িতে ট্যাক্সিতে সবই একরকম। কে জানে, সে এখনও সিঁদুর পরে কিনা, শাঁখা পরে কিনা।

আচ্ছা, যদি ওই অমলটার কথা মুছে ফেলে থাকে ও, যদি নিজের পুরনো জীবনের সাজেই অবিচল থাকে?

তাহলে তো আবার লিলির মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই লিলির বাপকেও ডেকে আনতে হয়। কুঞ্জ কি তবে এবার সেই পোস্টটা পাকাপাকি দখল করবে? তা করতে তো হবেই কুঞ্জকে। কন্যা সম্প্রদান করতে হবে না?

কিন্তু বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি কোথায়—কুঞ্জর চিন্তায় বাধা পড়ল। কারণ কুঞ্জর এই বন্ধ দরজায় জোরে জোরে ঘা পড়ল। নিশ্চয় খেতে ডাকছে।

কুঞ্জ এতক্ষণে অনুভব করে খিদেয় পেটটা জ্বালা করছে। কুঞ্জ তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেয়।

কিন্তু কুঞ্জকে কি ওরা খেতেই ডাকতে এসেছিল? অনেক বেলা হয়ে গেছে বলে বিচলিত হয়ে ওর বকুনির ভয় ত্যাগ করে? পাগল? এত ভালো কে বাসছে কুঞ্জকে? ব্রজ? বিপিন? নববালা?

ওরা দরজায় ধাক্কা দিয়ে কুঞ্জকে উপহার দিতে এসেছে একমুঠো জ্বলন্ত আগুন। যে আগুনে কুঞ্জর ওই দিবাস্বপ্নটি পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। সেই আগুনটা একটা খবর। কিন্তু আগুন তো খবরেরই হয়।

ওরা বলতে এসেছে, বহুক্ষণ অপেক্ষা করে করে এবার অধিকারীকে না জানিয়ে পারছে না,

লিলি, নিমাই আর সনাতন সেই ভোর সকালে কালী মন্দির দেখতে যাব বলে বেরিয়েছে, এখনও দেখা নেই। এরা অধীর হয়ে ঘর বার করতে করতে হঠাৎ সন্দেহের বশে ওদের ঘর দেখতে গিয়েছিল, দেখেছে তিনজনেরই জামাকাপড় জিনিসপত্র, সুটকেস গামছা আর্শি চিরুণী—সবই নিশ্চিহ্ন।

তার মানে পালিয়েছে। অথচ আশ্চর্য, কেউ এটা স্বপ্নেও সন্দেহ করেনি। আরও আশ্চর্য, জিনিসপত্রগুলো পাচার করল কি করে? নিশ্চয় রাতারাতি কোথাও সরিয়ে রেখেছিল!

কুঞ্জ যদি শুধু শুনত ওরা সেই ভোরবেলা কোথায় না কোথায় গিয়ে এখনও ফেরেনি, তাহলে কুঞ্জ পাগল হয়ে ছুটোছুটি করত। কিন্তু এরা শুধু সেই খবরটাই দেয়নি, এই জিনিসপত্রের খবরও দিয়েছে। কুঞ্জ তাই পাথরের মুখচোখ নিয়ে বসে আছে।

কিন্তু যে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে, সে-ই শুধু পাথর হয়ে যেতে পারে? আর অরণ্যবাসের অন্তরালে যে মানুষটা নিজেকে আরও আড়াল করে রেখে দেয় দেওয়ালের আড়ালে, অবগুণ্ঠনের আড়ালে? সে? না কি নতুন করে পাথর হবার আর অবকাশ নেই তার? পাথর দিয়েই বুক বাঁধা তার? না হলে অতবড়ো অপমানের পরও তো ছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিল না সে? এমন কি মাথাও ঠুকল না, কেঁদেও ভাসাল না!

সে শুধু বেড়ার ঝাঁপটা বন্ধ হবার শব্দ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনে নেমে পড়ে ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝিরিয়ে, তবু ছাতাটা হাতে নিয়েই চলেছে লোকটা। দেখতে পেল চলেছে, তারপর একটা ভাঙা বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আবার অনেক দূরে দেখা গেল।

দ্রুতদৃপ্ত ভঙ্গি! যে ভঙ্গি বহুকাল দেখেনি উমাশশী। ইদানীং যে ভঙ্গিটা দেখতে পায় এই গাছের আড়াল থেকে, সে ভঙ্গি শিথিল অনিচ্ছা-মন্থর। যায় যায় আর ফিরে ফিরে তাকায়। উমাশশীকে তাই আত্মগোপন করে থাকতে হয়।

আজ আর হল না আত্মগোপন করতে। আজ লোকটা গটগটিয়ে বেরিয়ে গেল।

বরুণ আন্দাজে বলেছিল, 'উনি অন্য ধাতুর।' কথাটা ঠিক। অন্য ধাতুরই। নইলে যে লোকটা ওকে অত যাচ্ছেতাই করে গেল, তার জন্যেই ওর মন পোড়ে?

লোকটা যে রাগের চোটে ছাতা মাথায় দিতে ভুলে গেছে, আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টিটা যেন জোর জোর হয়ে আসছে, এই ভেবেই মন পোড়েনি উমাশশীর। নিজেও যে ভিজছে, সে কথা মনে থাকে না, ভাঙাবাড়ির ওপারটা পর্যন্ত দেখতে থাকে।

আজ এখনও বেলা আছে, আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অন্য দিন তো অনুমানে দেখা। লোকটা যে টর্চ ধরে ধরে যায়, প্রকৃতপক্ষে সেই আলোটাই দেখা। তবু কোনো কোনো দিন, যেদিন জোৎস্নায় ভরা রাত থাকে, সেদিন উমাশশীর স্মরণীয় দিন।

অথচ ওই লোকটাকেই একদিন পুরনো কাপড়ের মতো পরিত্যাগ করে চলে এসেছিল উমাশশী। উমাশশীকে একদিকে টেনেছিল দুরন্ত প্রলোভন, আর একদিকে ঠেলে দিয়েছিল দুরন্ত অভিমান। এই দুই টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে উমাশশীর জীবনের বুনুনিটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে জট পাকিয়ে গিয়েছিল।

বৃষ্টিটা জোর হতেই উমাশশীকে ফিরে আসতে হল। এসে দাওয়ায় বসে সেই মেডেলগুলো হাতে তুলে নিল উমাশশী। আর অতখানি অপমানেও যা হয়নি, তাই হল হঠাৎ। হঠাৎ প্রবল বর্ষণে ভেসে গেল তার চোখ গাল বুকের কাপড়।

উমাশশীর বিধাতা উমাশশীকে এত নিষ্ঠুর করে কেন গড়েছিল? কী হত, যদি উমাশশী ওই

মেডেলের খবরে আহ্লাদ প্রকাশ করত! উমাশশীর কোন্ মুখটা আছে যে সেই তিন বছরের মেয়েটার দাবি তুলে, তার যাত্রার আসরে নাচায় ব্যঙ্গোক্তি করল?

উমাশশীর কি সত্যি মেয়ে বলে টান আছে তার ওপর? উমাশশী কি তাকে দেখলে চিনতে পারবে?

বহুবার তো বলেছিল ওই মহৎ মানুষটা, 'নিয়ে এসে দেখাই, নিয়ে এসে দেখাই।' উমাশশীই তো নিষেধ করেছে। নিষেধ করেছে উমাশশী। পাষাণের মতো নিষ্ঠুর বলে। 'দেখলে নতুন করে মায়ায় জড়াব' এটা যে সে ভেবেছিল মনে মনে, ওটা বাজে কথা। 'পাপের ফল' বলে বিতেষ্টা, এটাও বাজে কথা। মনকে চোখ ঠারা! আসলে ভয় ছিল পাছে আবার মেয়েটার দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ে। পাছে ও বলে বসে, 'মেয়ে তো বড়ো হচ্ছে, এবার মায়ের কাছে থাকাই ভালো।'

এই, এই ভয়েই উমাশশী লিলি নামের সেই তিন বছরের মেয়েটাকে 'মা' থাকতেও 'মা' নাম ভুলিয়ে রেখেছে!

অবৈধ বলে মমতা নেই, এটা কি সত্যি? নিঃসন্তান নারীচিত্ত, প্রথম যে সন্তানকে কোলে পেল, তার উপর থেকে কি মন সরিয়ে নিতে পারে? তাছাড়া—তখন তো উমাশশী অমল মুখুজ্যের আদরে সমাদরে ভাসছে। কুঞ্জ নামের একটা বুনো-মানুষের জন্যে দু'দণ্ড মন খারাপ করে বসে থাকবারও সময় নেই তার। তখন তাই সন্তানে ও ডগমগ।

অথচ সেই সন্তানকে সে দায়িত্ব নেবার ভয়ে বিলিয়ে দিয়ে রেখেছে। বিলিয়ে দিয়েছে না হয় একটা মহান লোকের হাতে, কিন্তু তার পরিবেশটা যে মহান নয়, তাতো উমাশশীর অজানা ছিল না।

যাত্রার দলে আছে মেয়ে, ছেলে সেজে পার্ট করছে। দরকার হলে সখী সাজছে, এসব তো জানতই উমা। যাত্রার অধিকারী নিঃস্বার্থ, তাই কোনোদিন বলেনি, 'দিন গুণছি কবে ওটা বড়ো হবে।'

বললেই বলতে পারত। উমাশশীর কিছু বলবার ছিল না। যাত্রার দলে মানুষ হওয়া মেয়ে লায়েক হয়ে উঠে আসরে নাচবে, এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ এই স্বাভাবিক নিয়মটার বিরুদ্ধেই উমা এমন একখানা প্রতিবাদের আস্পর্ধা দেখাল, যা এখন ভেবে মরমে মরে যাচ্ছে সে।

এ আস্পর্ধার কারণ কি? না ভালো লোকটা উদার লোকটা একদা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, 'ওকে আমি বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসারী করে দেব।'

ঘর-সংসার জিনিসটার ওপর কি তবে এত মোহ উমাশশীর যে, সেই আসা ভঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল? এটা তুলসী মন্দিরের মতো পবিত্র ঘর-সংসার পায়ে ঠেলে দিয়ে চলে এসে কি 'ঘর-সংসারের' মূল্য টের পেয়েছে উমাশশী?

দাওয়াতেও আর বসা চলল না। বৃষ্টি প্রবল হচ্ছে। উমাশশী ঘরে গিয়ে ততক্ষণে আছড়ে পড়ে, আর বার বার বলতে থাকে, 'ঠাকুর, মেয়ে জন্ম দিয়ে এত নিষ্ঠুর করে পাঠালে কেন?'

'ও যদি আর না আসে?—ও যদি সত্যিই মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে থাকে?'

হ্যাঁ, টাকা ও দেবেই তা জানে উমাশশী। উমাশশী কষ্টে পড়তে পারে, এমন কাজ ও করবে না। কষ্ট দেওয়া কাজটা উমাশশীরই একচেটে।

উমাশশীর আর একটা ভয়ানক বর্ষার রাতের কথা মনে পড়ে আজ।...মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল, বাজ চমকাচ্ছিল।...অধিকারী কুঞ্জ দাস খাওয়া-দাওয়ার পর বলেছিল, 'যা দেখছি আজ তো আর যাওয়া হল না।'

বলে দাওয়ার ভিতরের জলচৌকিটার উপর উঠে বসেছিল। তারপর নিজ মনে বাতাসকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছিল, 'দাওয়ায় একখানা তক্তপোষ-টক্তপোষ পাতিয়ে রাখতে হবে। এ রকম বেঘোরে পড়ে গেলে বসে রাত কাটাতে হবে না।'

উমাশশী তখন কোনো কথা বলেনি। তারপর রাত বোধকরি বারোটা, বৃষ্টি একটু ধরেছিল তখন উমাশশী ঘর থেকে বলে উঠেছিল, 'এখন তো বিষ্টি কমেছে, এইবেলা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে হয়।'

লোকটা অবাক হয়ে গিয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি? বোধহয় আশা করেনি এমন কথা শুনতে হবে। তাই বিস্ময়ের গলায় বলে উঠেছিল, 'এখন রওনা দেব?'

'তাতে কি?' উমাশশী অভয় দিয়েছিল, 'শুধু এই হাঁটাটুকু! রাতভোর তো ইস্টিশনেই পড়ে থাকা হয়।'

ঘরের ভিতরকার অভয়বাণী বৃষ্টির ছাঁট খেয়ে বসে থাকা মানুষটার প্রাণে শীতল বারি নিক্ষেপ করেনি। সে বলেছিল, 'ওঃ। তা যাচ্ছি। তবে এমন রাতে লোকে বেড়ালটা কুকুরটাকেও দূর দূর করে তাড়ায় না।' বলে উঠে পড়েছিল।

আশ্চর্য, উমাশশী এত নিষ্ঠুরতার শিক্ষা কোথায় পেয়েছিল? তাই উমাশশী ছুটে এসে পথ আটকে বলেনি, 'আমার ঘাট হয়েছে, মাপ করো।' উমাশশী সেই ঘর থেকেই বলেছিল, 'বেড়ালটা কুকুরটা হলে তাড়ায় না, মানুষ বলেই উল্টো নিয়ম।'

'মানুষই। বাঘ ভালুক নয়। কামড়ে দেবে না।'

উমাশশী তথাপি টলেনি। বরং হেসে উঠে বলেছিল, 'বিশ্বাস কি? তাছাড়া পাড়াপড়শি তো বাঘ ভালুকের কাছাকাছি। সকালবেলা ছাতা জুতো দেখলে—'

কুঞ্জ নিজস্ব ভঙ্গিতে চড়ে উঠেছিল, 'কেন, এ কথা বলা যায় না দেশের লোক খোঁজ নিতে এসেছিল, বৃষ্টিতে আটকা পড়ে—'

উমাশশী আরও হেসে উঠেছিল। হেসে হেসে বলেছিল, 'জিগ্যেস করলে বলা যায়। জিগ্যেস না করলে? গায়ে পড়ে বলা যায় না তো?'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি।' বলে চলে গিয়েছিল অধিকারী কুঞ্জ দাস। কিন্তু 'ঠিক আছে, যাচ্ছি' ভিন্ন কবে আর 'আচ্ছা, চললাম—' অথবা 'আচ্ছা, আসি' বলে কুঞ্জ? কুঞ্জর বিদায় নেবার ভঙ্গিটাই তো রাগ-রাগ! বিদায় যে নিতে হচ্ছে, সেটাই রাগের।

কিন্তু উমাশশী কী করবে? উমাশশী তো নিজেই নিজের সুখের পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে।

উমাশশী নিজেই নিজের সুখের পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু উমাশশীর মেয়ে?

তা সে নাকি 'বুদ্ধিমান', অন্তত তার পালক পিতা তাই বলত, তা সে বুদ্ধিমান বলেই বোধকরি সুখের পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে।

একটা মাটকোঠার হোটেলের দোতলার ঘরে লোহার চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে উমাশশীর মেয়ে বলে, 'পোপাইটারের জন্যে একটু মন কেমন করছে বটে, তিন তিনটে মানুষ কেটে পড়ায় অসুবিধেতে পড়বে ও। তবে খুব চালাকি হল একখানা!'

নিমাই বলে, 'সনার যা পার্ট, ও তো রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে আসরে ছেড়ে দিলেও হয়। আমারটা ব্রজরাজ দেবে অখন যা হোক করে চালিয়ে, আর তোর? সে বিষয়ে নিশ্চিন্দে থাকিস, তোকে আর আসরে যেতে হত না। চারুহাসিনীর জ্বর ছেড়েছে, ওর হকের ধন মদনমোহন—ও ছাড়ত ভেবেছিস?...জোর করে ছাড়ালে ও তোর গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিত! তোর ভাগ্যে ওই একটি রজনীই।'

উমাশশীর মেয়েকে শাড়ি পরে মোহিনী দেখায়। উমাশশীর মেয়ের এক মুখ পান খাওয়া পানের রসটা ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, আর সে অতীতের এক উমাশশীর মতো ঠোঁট উল্টে বলে, 'ইস, তাই বৈকি। দেখো 'সহস্‌রো রজুনী হবে! তুমি একবার খোলো দল।'

ওইভাবে ঠোঁট উল্টে বলত উমাশশী, 'আমার কপালে অশেষ দুঃখু আছে? ইস! কেন? দেখো পরে।' বলত বুড়ি পিসশাশুড়িকে। যে নাকি বৌয়ের বেচাল দেখে গাল-মন্দ করতে বসত।

উমাশশীর মেয়ে সেই ভঙ্গিতে বলে, 'ইস, তাই বৈকি। তুমি আগে দল খোলো।'

জ্ঞানাবধি 'দল' দেখে আসছে, আর সেই বিরাট দলবল আর তাদের সাজ-সরঞ্জাম, বাক্স বিছানা নিয়ে নিতান্ত অনায়াসে আনাগোনা করতে দেখেছে। 'দল গড়া' যে চারটিখানি কথা নয়, নিমাইয়ের বাবারও যে সে সাধ্য নেই, সে জ্ঞান হয় না লিলির।

লিলি সাজানো আসরে নিজেকে কল্পনা করে, আর বলে, 'দলটা গড়ে ফেল, জোগাড় যন্তর করো। দেরি কিসের?'

আর এ বলে, 'বিয়েটারই বা দেরি কিসের, নিজেরা নিজেরাই তো করে নিতে হবে। জগাদা বলেছিল 'সব ব্যবস্থা করে দেবে'। সে তো বেইমানী করল, এলই না। সনাদাটা তবু মায়ায় পড়ে এসেছে, তা সে তো বোকার ধাড়ি। কার পিত্যেশ?'

নিমাই বলে, 'হবে হবে! সুবিধে হোক—'

লিলিবালা ঝঙ্কার দেয়, 'হবে হবে? আমি মলে? বিয়ে কোথায় তার ঠিক নেই স্বামীস্ত্রী সেজে বসে আছি, আর যা খুশি করে চলেছ তুমি। এ-সব আমার ভালো লাগছে না।'

কিন্তু ভালো কি নিমাইয়ের লাগছে? ওই খুশিটা ছাড়া? প্রোপ্রাইটারের বাক্স থেকে লিলি যে টাকাটা সরিয়ে এনেছিল, সে টাকা তো ফুরিয়ে এল। লিলির গায়ের গহনাগুলো তো গিলটির, নিজের আঙুলে একটা আংটি পর্যন্ত নেই, উপায়টা কি?

লিলিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল নেহাত লোভের বশে। তা ছাড়া অধিকারীকে জব্দ করবার মনোভাবও একটু ছিল। যা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নিমাইকে!

সেদিন অমন খপ করে বলে বসল, 'দেখলি? দেখলি লিলির অ্যাক্টো? ওর পায়ের নখের যুগ্যি ক্ষ্যামতাও নেই তোদের! অথচ এই সাত বছর ধরে ঘষটাচ্ছিস!'

নাও দেখো, যার পায়ের নখের যুগ্যিও ক্ষ্যামতা নেই, তাকে পায়ে বেঁধে নিয়ে চলে আসবার ক্ষ্যামতা আছে কি না নিমাইয়ের।

এত তাড়াতাড়ি হয়তো চলে আসত না নিমাই, সেদিনের অপমানটাও কাজ করেছে। তাছাড়া ভেবেছিল অজানা অচেনা জায়গা থেকে সরে পড়াই সুবিধে। কেউ বলে দেবে না, 'আরে তাদের তো দেখলাম পেয়ারাতলার বাসে উঠতে'।...চলে এসেছে। খরচ চালাতে হাড়ে দুব্বো গজাচ্ছে।

এদিকে সনাতন আর উচিতমতো হোটেল খরচা পাচ্ছে না। অতএব সনাতন দু'বেলা শাসাচ্ছে, 'চলে যাব। বলে দেব গিয়ে অধিকারীকে।'

লিলিবালা বলে, 'বলে দিলে তো প্রেথম ফাঁসি তোমার! তুমিও সমান পাপে পাপী। জেরার সময় আমি বলব, তুমিই আমায় ফুসলে এনেছ, নিমাইদা তোমার সঙ্গী মাত্তর। মায়ার প্রাণ তাই এসেছে।'

'বলবি একথা?' সনাতন বলে, 'মুখে বাধবে না?'

'বাধবে কেন? তুমি কি কম শয়তান? সেদিন ঝগড়ার মুখে বলনি ওকে, 'লিলির দায় আমি পোহাতে যাব কেন? তুই কি আমায় ওর ভাগ দিবি? তবে? শয়তান আবার কাকে বলে?...'

খাটো স্কার্ট আর আঁটো জ্যাকেটের মধ্যে বন্দী থেকেও লিলি জগৎ-সংসারের কোনো কথা শিখতে বাকি রাখেনি, তাই নববালা বাসমতীদের ভাষার সঙ্গে লিলির ভাষার বিশেষ কোনো তারতম্য নেই।

তবে লিলি জানে নিমাই তার 'বিয়ে করা স্বামী', শুধু অনুষ্ঠানটা বাকি।—বাকিটা কেবলমাত্র নিমাইয়ের আলস্যের জন্যে হচ্ছে না।

কিন্তু নিমাই? সেও কি তাই জানে?

আহা, কুঞ্জ অধিকারীর কি হল? 'ভবানী অপেরা'র প্রোপ্রাইটার মিস্টার দাসের? সে কি আজও পাথর হয়ে বসে আছে? নাঃ, তা বসে থাকলে কি চলে? পৃথিবী বড়ো কঠিন জায়গা। বাস্তব বড়ো নির্মম!

যারা বায়নার টাকা দিয়েছে, দশদিন ধরে এককাঁড়ি লোক পুষছে, তারা ছেড়ে কথা কইবে? 'পালা' নামাতেই হয়েছে কুঞ্জকে। চারুহাসিনীকে দিয়েই চালাতে হয়েছে। রব তুলতে হয়েছে লিলিবালার দিদিমার হঠাৎ মরমর অসুখ, তাই চলে যেতে হয়েছে তাকে।

তা যাক, সারা পালাটা এমনিতেই জমজমাট! বরুণের কলমের গুণেই মুহুর্মুহু হাততালি, আর চারুহাসিনীও একেবারে ফেলনা নয়। চালাচ্ছিল তো এতদিন।

পালা শেষে জাল গুটিয়ে চলেও আসতে হয়েছে বৈকি কুঞ্জকে কোমর তুলে। লিলিবালার দিদিমার মরণে লিলিবালা সেখানে আটকে পড়েছে বলে কি অধিকারী কুঞ্জ দাস ভেঙে পড়ে মাটিতে পড়ে থাকবে?

তবে হ্যাঁ, দু'দুটো ছেলেকে লিলির সঙ্গী হিসেবে পাঠিয়ে অসুবিধে একটু হয়েছে, তারাও তো আটকে পড়েছে। তা কি আর করা যাবে? তেমনি, যে মানুষ পালা লেখা ছাড়া আর কখনও কিছু করে না, সেই মানুষই বুক দিয়ে করল!

ছড়ানো জাল গুটিয়ে আবার কাটোয়ায় এনে ফেলে সবে স্থির হয়ে আমতা লাইনের সেই গ্রামের পথটায় পাড়ি দেবে, হঠাৎ বাঁকুড়া থেকে এক তলব এসে হাজির।

'নতুন কি এক পালা করেছেন না কি চোরাকারবারিদের ঠুকে, মেদ্‌নীপুরে জয়জয়কার করে এসেছেন, বায়না করতে এসেছি তার।'

কুঞ্জ গম্ভীরভাবে বলে, 'ওইটি আজ্ঞে করবেন না বাবুমশায়, আর যেটা বলেন রাজী!'

হ্যাঁ, বাইরের লোকের সঙ্গে কথা কইতে কুঞ্জ বাবুমশায় টশায় বলে।

এসেছেন বাঁকুড়ার নামকরা এক ডাক্তার বাড়ি থেকে, ডাক্তারের শালা জন্মাষ্টমী উৎসবে যাত্রাগান দেবেন। লোকটা একটু স্বদেশী স্বদেশী। ছেলেমেয়েরা নাকি চেয়েছিল জলসা হোক, তিনি বলেছেন 'না, দেশের পুরনো জিনিস হোক।'

কথাটা ভালো লাগে কুঞ্জর। কিন্তু ওই পালাটা? যেটার সঙ্গে কুঞ্জর জীবনের সব সর্বনাশ জড়িত। 'ওটা হবে না বাবুমশায়, আর যা বলেন।'

বাবুমশায় সন্দেহের গলায় বলেন 'কেন ওটাতে পুলিশের কোপে-টোপে পড়েছিলেন নাকি?'

'না না! সে সব ভয় কুঞ্জ অধিকারী করে না। ওটার মানে, অ্যাকটার অ্যাকট্রেস নেই এখন।'

'নেই কি মশাই? এই ক'দিন আগেই তো মেদিনীপুরে কাটিয়ে এলেন।'

'দু'তিনজন পালা সেরে দিয়েই দেশে গেছে।'

'আহা, এখনও তো দু'চারদিন রয়েছে। দেশ থেকে আনান।'

কুঞ্জ তবু ঘাড় নাড়ে, 'আসবে না, দেশে অসুখ।'

বাবুমশাই কিন্তু নাছোড়বান্দা। এটা তিনি করিয়ে তবে যাবেন। টাকা নিয়ে এসেছেন বায়নার।

কুঞ্জ হতাশ গলায় বলে, 'আমার অসুবিধেটা বুঝছেন না বাবু, ওটা ছাড়া অন্য কিছু বলুন।'

তা হয় না। ওটাই চাই। আপত্তির কোনো অর্থ নেই। দুটো মাত্র কারণ থাকতে পারে আপত্তির, এক আইনের দায়, দুই কম্পিটিশনে নামবার জন্যে নতুন নাটক তুলে রাখছে।

প্রথমটা যখন নয়, তখন দ্বিতীয়টা। কিন্তু ওটা অধিকারীর ভুল ধারণা। তাতে বরং নাম ছড়াবে। যুক্তির শরশয্যা।

হয়তো এই আপত্তিটাই বাবুমশাইকে এমন আগ্রহে উত্তেজিত করেছে। আপত্তি করেছে? নিশ্চয় তাহলে ভিতরে কোনো গূঢ় কারণ আছে। তবে ওই আপত্তিটা ভাঙবার জন্যে গাঁইতি শাবল লাগাও।

অনেক কথা অন্তে নিরুপায়ে কুঞ্জ হতাশ গলায় বলে, 'আচ্ছা বাবুমশায়, আপনি একটা বেলা সময় দিন আমায়, চিন্তা করে বলব। বুঝতেই তো পাচ্ছেন, সাধ্যপক্ষে এত কথা কইতাম না আমি।'

বাবুমশাই বলেন, 'ঠিক আছে, এখানে আমার ভাইঝির বাড়ি, থাকব আজকের দিনটা। কোথাকার মানুষ কোথায় এসেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, বিফল হয়ে ফিরে যাব? আপনার দলবলের আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হবে না, দেখবেন।'

বাবুমশাই চলে যাবার পর কুঞ্জ ভয়ানক একটা অস্থিরতা অনুভব করে। যা কাম্য, যা প্রার্থিত, তাই এসে যাচ্ছে হাতের মুঠোয়, যথার্থ সম্মান। অথচ কুঞ্জ তা নিতে পারছে না। কেন? বাধাটা কোথায়? পালাটা অপয়া? ওই 'মহাকালের খাতা' থেকেই কুঞ্জর জীবনের হিসেবের খাতা এলোমেলো হয়ে গেল।

কিন্তু ওই কুসংস্কারটা যদি না মানা যায়? যদি কুঞ্জ ভাবে ওগুলো ঘটতই। সুখ-দুঃখ, বিপদ-সম্পদ সবই চন্দ্র সূর্যের মতো অমোঘ নিয়মের অধীন, তারা যথাসময়ে আসবেই মানুষের জীবনে, যতটা আলোছায়া ফেলবার তা ফেলবেই। তা হলে? ঠিক তাই।

লিলি লক্ষ্মীছাড়ির পালিয়ে যাওয়া কুঞ্জর কপালে ছিল। উমার সঙ্গে অকারণ বিচ্ছিন্নতা কুঞ্জর কপালে ছিল। এসব অমোঘ অনিবার্য। কুঞ্জ সেই ব্যাপারটাকে কুসংস্কারে ফেলে অন্য চেহারা দিচ্ছে।

নাঃ, এসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়। কুঞ্জ নেবে বায়না। লিলি মুছে যাচ্ছে চারুহাসিনী তো আছে। নিমাই চুলোয় যাক, বরুণকেই এবার আসরে নামিয়ে ছাড়বে কুঞ্জ।

হঠাৎ একটা নতুন উৎসাহে টগবগিয়ে ওঠে কুঞ্জ। আর সকালে যে সেই লোকটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে, তার জন্যে লজ্জাবোধ করে। ওকে না হয় বলে দেবে, 'মনস্থির করে ফেললাম বাবুমশায়! নিলাম বায়না।'

বরুণ আপত্তি করবে? সে আপত্তি খণ্ডন করে ছাড়বে কুঞ্জ। বলবে 'নিজের ভাষা একবার নিজের মুখে বলে দেখেছ? দেখো হে কী উদ্দীপনা পাবে!'

ভাবতে ভাবতে নিজেই উদ্দীপনা বোধ করে কুঞ্জ। নতুন শহরের নতুন আসর তার আলোকমালা নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কুঞ্জ সেখানে বুকভর্তি মেডেল নিয়ে দীপ্ত মহিমায় নান্দীপাঠ করে...'শুনুন বাবু সকলরা, এ এক ভেজালদার চোরাকারবারির কাহিনি। কিন্তু এ একের কাহিনি নয়। সমস্তের কাহিনি। মানুষ মারার কারবার খুলে বসেছেন এঁরা!...কিন্তু বাবুমশায়, আজও চন্দ্র সূর্য উঠছে, তাই এঁদের হিসেব লেখা হচ্ছে। লেখা হচ্ছে 'মহাকালের খাতায়'।' কুঞ্জর শিথিল মন খাড়া হয়ে ওঠে।

কুঞ্জ বরুণের কাছে আর্জি পেশ করতে যায়। ওই ভেজালদারের এক বন্ধু আছে, যে তার হিতৈষী যে সত্যব্রতী। তার মুখে অনেক উপদেশ বাণী আছে। সে পার্টটা নিমাই করে। নিমাইয়ের উচ্চারণ ভালো। গেলবারে ব্রজকে দিয়ে চালাতে হয়েছে। কিন্তু ব্রজর উচ্চারণ অস্পষ্ট। অমন চরিত্রটা, অমন ডায়লগ, ওই দোষে যেন ঝুলে পড়ল।—বরুণ যদি নিজে ওতে নামে, মারকাটারি হবে।

তা বরুণ বুঝি সত্যিই ওই মূর্খ কুঞ্জ দাসের কাছে সেই অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে। যে বন্ধন স্বাধীন চিত্তের স্বাধীনতাটুকু হরণ করে নেয়। নইলে কুঞ্জর অনুরোধ রাখতে রাজী হয় বরুণ?

বলে, 'কিন্তু একদিনের জন্যে।'

'ঠিক আছে, তাই সই।'

কুঞ্জ আবার নবীন বয়সের উদ্যম পায় যেন? কুঞ্জ চারুহাসিনীকে গিয়ে অবহিত করে। তারপ বাঁকুড়ার ডাক্তারবাবুর শালাকে জানায়, 'মনস্থির করেই ফেললাম বাবু।'

এই উত্তেজনার মাথায় পরদিনই বেরিয়ে পড়ল স্টেশনের উদ্দেশে। গিয়ে পড়ে বলতে তো হবে, 'বড়োমুখ করে বলেছিলাম মেয়েকে দিয়ে যাব। মুখ থাকল না। মেয়ে সেই মুখে চুনকালি দিয়ে চলে গেছে!'

দেওয়ালের ওপার থেকে নিশ্চয়ই ব্যঙ্গ হাসি উঠবে। মেয়ে আসরে নেচে মেডেল লোঠার খবর থেকেই যে এ খবরটাও পাওয়া গিয়েছিল, সেই উল্লেখ থাকবে সে হাসিতে। থাককু, তবু বলতে তো হবে। জানাতে তো হবে মুখে কুটো দিয়ে, তোমার গচ্ছিত ধন আমি রক্ষে করতে পারিনি!

কদিন ধরেই মনে মনে চালাচ্ছিল এ মহলা, কিন্তু ভয়ানক একটা ভয় যেন গ্রাস করে ফেলছিল কুঞ্জকে। কুঞ্জ পেরে উঠছিল না।

নিজে পথ করে কাঠগড়ায় উঠতে কে যায়? নিজে দড়ি টেনে গলায় ফাঁসি কে লাগায়? কিন্তু আজ হঠাৎ উৎসাহের ঝোঁকে বল সংগ্রহ করে ফেলল। চলল মহলা করতে করতে। উমাকেও বলতে হবে, 'যা হবার তা হবেই। তাকে রোধ করা যায় না।'

কিন্তু কুঞ্জর গ্রহ নক্ষত্র বোধহয় এখন প্রতিকূল, তাই কুঞ্জর অত মহলা বিফলে গেল। কুঞ্জ একটুর জন্যে ট্রেন ফেল করল। আজ আর সুবিধের ট্রেন নেই। অথচ আর সময়ও নেই। কাল বাদ পরশু বাঁকুড়ায় যাবার ব্যবস্থা।

এই দলবল, এই পাহাড় প্রমাণ সাজসরঞ্জাম! এসব গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা নয়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে তো ছোট নেই। বিপিন থেকে শুরু করে সকলেই প্রায় বয়স্ক। তাঁদের আবার ধমক দেবার জো নেই। তোয়াজ করে করে নিয়ে যাওয়া। দুটো দিন হাতে রাখতেই হবে। ট্রেনের টাইম আছে, ট্রেনের ধকল আছে।

এ যাত্রায় আর হল না। ঘুরে এসে হবে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা পয়ষট্টি! ভাবছেই তো ঝগড়া করে চলে এসেছি, তাই যাচ্ছি না, আরও দু'দিন ভাবুক!

কুঞ্জ আজ বাইরে গেছে। কালকের আগে আসবে না। নববালা আর বাসমতী রান্নাঘরে বসে বিড়ি টানছিল, আর সুখ দুঃখের কথা কইছিল।

আবার হট্ হট্ করে ছোটো এক দেশে।—অরুচি ধরে গেছে বাবা!—এর থেকে এসব ছেড়ে-ছুড়ে ইস্টিশানে পানের দোকান দিলে হয়। তা থেকে খুব পেট চলবে। অথচ খাটুনি নেই।

আর এই দস্যি কাজে? হাড় পিষে যায়! শুধু তো পার্ট করা নয়, এই রাবণের গুষ্টির ভাত রাঁধা!

গল্প যখন উদ্দাম, হঠাৎ বুকের ভেতর ধড়ফড়িয়ে উঠল। এ কী, অধিকারীর গলা না? চলে গিয়েছিল যে? ওরা তো ধরে নিয়েছিল মাঝে মাঝে যেমন একদিনের জন্যে ডুব মারে কর্তা, তেমনি গেছে।

এই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা করে তারা। কোথায় যায় অধিকারী? এদিকে তো খাজা-গোঁয়ার, ওর যে কোথাও কোনোখানে ভাবের লোক আছে, তা তো মনে হয় না। তবে আছে কে? বলে না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। আসেও ঠিক নিয়ম মাফিক।

জল্পনান্তে ওরা ধরে নিয়েছিল নিশ্চয় কোনো দেবস্থানে যায়। অনেকের আবার ওতে লজ্জা আছে। তাই চেপে যায় কথাটা। ঠাকুর দেবতা করে, লুকিয়ে।

আজও তাই গিয়েছে জানে, হঠাৎ কর্তার গলার স্বর। কাকে যেন বলছে, 'নাঃ বেরোলাম না, ফিরেই এলাম। শরীরটা তেমন ইয়ে ঠেকল না।'

হাতের বিড়ি ফেলে দিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বাসমতী বলে উঠল, 'শরীর বুঝি খারাপ?'

'শত্রুর শরীর খারাপ হোক।' বলে চলে যায় কুঞ্জ।

কুঞ্জর কানে একটা সুর এসে বাজে। কে কোথায় কী সুর বাজাচ্ছে কে জানে। কুঞ্জর বিস্বাদ মনটা হঠাৎ একটা আনন্দের আস্বাদে ভরে যায়। কুঞ্জ ভাবছিল, এ পৃথিবীতে বুঝি ভালো জিনিস বলে কিছু নেই। কিন্তু তা তো নয়। আছে ভালো জিনিস আছে। সুর আছে।

সুর আছে, এটা যেন কুঞ্জ প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল। সুর হারানো প্রাণ নিয়ে কেবল ভেসে এসেছে, জগতে শুধু বেসুরো অ-সুর আছে। আর কুঞ্জর হাতে চাবুক আছে। অথচ এখনও সুর আছে, গান আছে!

কুঞ্জ তার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ভাবে, তার পৃথিবীকে কি আবার সুরে ভরে তোলা যায় না? হয়তো ঠিক এই ভাষায় ভাবতে পারে না মূর্খ কুঞ্জ, তবে ভাবটা এই।

জীবনের রাজপথে চলতে চলতে, তার অনেক গলি ঘুঁজিও চোখে পড়ে বৈকি। দেখা যায় সেখানেও লোকে দিব্যি বাস করছে বড়ো রাস্তার ধারের মানুষদের মতোই। কতসময় কত 'বিয়ে না হওয়া' 'স্বাম স্ত্রী'কে ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মতোই সংসার করতে দেখল কুঞ্জ, দেখল কত বিধবাকে সহজভাবে একটা আত্মীয়পুরুষের ঘর করতে। অথচ তাদের মধ্যে কোনোখানে অস্বচ্ছন্দতা নেই।

কুঞ্জই বা কেন তবে একটা দৈবাৎ উল্টোপাল্টা হয়ে যাওয়া ঘটনাকে সোজা করে নিতে পারল না? কেন চিরদিন দেওয়ালের বাইরে রইল? এটা কি কুঞ্জরই ত্রুটি নয়? কুঞ্জ যদি দাবি খাটাত? কুঞ্জ যদি ভয়ে না মরত? কিন্তু কুঞ্জ ভয় পায়। কুঞ্জ ঠিক করল এবার, কুঞ্জ নির্ভয় হবে। কুঞ্জ দাবির বলে দেওয়াল ভাঙবে। দেখবে না কেমন মুখ দেখায় সে।

বাঁকুড়ার পালাটা একবার সেরে আসতে পারলে হয়। কিন্তু পালা তো সহজে মেটে না। বাঁকুড়া থেকে আবার পুরুলিয়া ডাক আসে। হাততালির স্রোতে কুঞ্জ নামের মানুষটার ভিতরের সত্তটা যেন ভেসে ভেসে দূরে সরে যায়। পুরো একটা লরি ভাড়া নিয়ে 'ভবানী অপেরা' পার্টি বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়ায় রওনা হয়।

এর ফাঁকে কুঞ্জর কাটোয়ায় বাড়িতে সনাতন নামের সেই পালিয়ে যাওয়া ছেলেটা ঝোড়ো কাকের মূর্তি নিয়ে এসে আরও দুটো পালানো মানুষের কীর্তি কাহিনিতে রং চড়িয়ে চড়িয়ে গল্প করে পুরনো করে ফেলে, এখন মনের সুখে খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে।

আর খামে মোড়া একটা চিঠি এসে কুঞ্জর ঘরের চৌকির ওপর পড়ে আছে। পিয়ন ফেলে দিয়ে গেছে জানলা দিয়ে।

চিঠিটার মধ্যে শুধু একটাই লাইন, নাম সম্বোধনহীন।

'মতলবটা কী? না খাইয়ে মারতে চাও বুঝি?'

পুরুলিয়া থেকে ফিরে এল 'ভবানী অপেরা' পার্টি নতুন মেডেল নিয়ে।

একটা ভেজালদার তার নিজ পরিবারের সকলের মৃত্যুর কারণ হওয়ায় যেমন লোকে 'বেশ হয়েছে' বলেছে, তেমন কেঁদেছে, শিউরেছে। এবং নাট্যকার আর পরিচালকের দরদ আর দুঃসাহসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে লোকে।

ভরা মন নিয়ে এসে ঢুকল কুঞ্জ, আর এসেই দেখল সনাতন। দেখেই চড়াৎ করে পায়ের রক্ত মাথায় উঠল তার! বলল, 'তুই এখানে? আবার তুই মুখ দেখাতে এসেছিস?' বলে পায়ের জুতো খুলে মারতে উঠে থেমে গেল।

'মুখ দেখানো' শব্দটাই হঠাৎ মনের মধ্যে আলোড়ন তুলল। জুতো ফেলে বলল, 'আর দুটো কই?'

'তারা আসেনি' ঘাড় গুঁজে উত্তর দেয় সনাতন।

'তারা আসেনি? শুধু তুমি? কেন তোমারই বা আসবার দরকার কি ছিল? কোথায় তারা?'

'জানি না।'

'জানিস না? মিথ্যেবাদী হারামজাদা! একসঙ্গে ভাগলি, আর—'

'আমি ভাগিনি, ওরাই আমায় বলে...' সনাতন বোঝে এই মত্ততায় ছাড়া কথাগুলো বলা যাবে না। তাই সনাতন তড়বড় করে বলে ওঠে, 'যা কষ্ট দিয়েছে আমায়! খেতে দেয়নি—তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'খেতে দেয়নি? খেতে? নবাব খাঞ্জা খাঁ আবার খেতে চান! বলি ওরাই বা কোথা থেকে খেতে দেবে শুনি?'

সনাতন এখন রাজসাক্ষী। সনাতনকে এখন নিজের দিক বাঁচিয়ে কথা বলতে হবে। তাই সনাতনের বলতে বাধে না, কর্তার ঘর থেকে টাকা চুরি করে পালিয়েছে লিলি। আর সে টাকা শেষ হতে লিলি রোজগার ধরেছে। না করে উপায় কি! খেতে তো হবে।

'রোজগার!'...কুঞ্জর অসতর্ক কণ্ঠ বিস্ময়ের চাবুকে আহত হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলে, 'কিসের রোজগার?'

সনাতন ঘাড়টা হেঁট করে। আর হঠাৎ তার সেই হেঁট হওয়া ঘাড়ের ওপর খটাখট করে এসে পড়ে একটা ভারী জুতোর পাটি। 'বলবি আর? বলবি আর?'

সনাতন ছুট দেয়। আর কুঞ্জ জুতোটা হাত থেকে ফেলে ঘরে ঢোকে। ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে যায় কুঞ্জ। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে চৌকির ওপরকার জিনিসটার দিকে।

তারপর জুতোর হাতটা ধুয়ে এসে, আস্তে খামটা খোলে। পড়ে—'মতলবটা কি? না খাইয়ে মারতে চাও বুঝি?'—আবার পড়ে।—আবার পড়ে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দু'দিক থেকে জুতো দু'পাটি কুড়িয়ে নিয়ে পায়ে দিয়ে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

আবার আমতা লাইনের সেই গণ্ডগ্রামটার সেই পায়ে চলা সরু পথের উপর দু'পাটি ভারী ভারী জুতোর ছাপ পড়ে...ভারী জুতো আর আধময়লা ধুতি শার্ট পরা একটা লোককে আবার সেই বেড়ার দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে দেখা যায়।

ভিতরের দৃশ্যটি যথাযথ। সেই উঠানে তুলসী ঝাড়, এখানে ওখানে গাঁদা টগর জবা, দাওয়ায় উঠতে তিনটে সিঁড়ি। কোনো কিছুর ওদিক ওদিক নেই। তবু যেন বুকটা কেঁপে ওঠে কুঞ্জর।

তবু কুঞ্জ অধিকারীর মনে হয় যেন বাড়িটা শ্মশান শ্মশান। যেন এখুনি কোনোখান থেকে প্রেতাত্মারা কথা কয়ে উঠবে।

কী হয়েছে? কেউই তো থাকে না কোনো দিন, তবে আজ এমন কেন? সত্যিই তো তাহলে—

কিন্তু আজও কুঞ্জ দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কেন? কুঞ্জর যে সংকল্প ছিল এবার আর ভয় নয়। এবার নিজের দাবিতে সবলে ঘরে প্রবেশ করবে। এবার বলবে, 'জগতে কতই দেখলাম। কত ভুলের কারবার 'ঠিক'-এর বাজারে চলে যাচ্ছে, কত গলি ঘুঁজি রাজরাস্তায় এসে মিশেছে। তবে দৈবাতের একটা ভুল শুধরে নিতে বাধা কোথায়?...ভুল তুমিও করেছ, আমিও করেছি, ব্যস শোধ-বোধ। আবার জীবনের পথে—।'

কিন্তু সে সব কথা হারিয়ে গিয়ে আবার শুধু ভয় কেন? কেন আজও দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে বোকার মতো? কতকাল ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ও? অনন্তকাল?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল কুঞ্জ। দেখতে পেল, উঠোনের দড়িতে একটা কাথা শাড়ি সেমিজ শুকোচ্ছে, দেখল দাওয়ার ধারে মাজা ঘটিতে জল। তার মানে বাড়িতে জ্যান্ত মানুষ আছে।

আর সে নিত্য কাজ করছে। কোথায় তবে গেল সে? পড়শীর বাড়ি? পুকুরে জল আনতে? কতক্ষণের জন্যে?

ভরা রোদ্দুরের বিকেল, চারিদিক আলোয় খাঁ খাঁ করছে, শূন্য বাড়ির মাঝখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে গলাটা শুকিয়ে আসে কুঞ্জর। আর নিজেই হঠাৎ সে প্রেতাত্মার গলায় কথা বলে ওঠে, 'একটু জল পাওয়া যাবে? খাবার জল?'

কাকে বলে ওঠে, জানে না। কিন্তু তার এই অবোধ প্রশ্নের উত্তর এসে যায় হঠাৎ! ঘরের মধ্যে থেকে একটা ক্ষীণ রোগীকণ্ঠ উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, 'কে? কে? জল চাইল কে?' সদ্য ঘুম ভাঙার গলা? না? জ্বরে আচ্ছন্নর গলা।

কুঞ্জর বিহ্বল চেতনা যেন ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। কুঞ্জর সেই সাহসী সংকল্প দৃঢ় হয়ে দাওয়া থেকে ঘরে এনে ফেলে কুঞ্জকে! অতএব কুঞ্জর ঘরে ঢোকা হয়।—হয়।—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে পিছিয়ে আসতে হয় কুঞ্জকে। বুঝিবা চোখটাও বুজে। বিছানায় যে পড়ে আছে, সে কে!

মুখের প্রায় সমস্ত চামড়াটা পোড়া কোঁকড়ানো, কালো জামড়ো পড়া।...তার মাঝখানে মাঝখানে সত্যিকার রঙের এক এক চিলতে আভাস যেন আরও ভয়াবহ বীভৎসতার সৃষ্টি করেছে।

যে 'সত্যি'টা 'পরী'র তুলনাবাহী ছিল। আর যার অহঙ্কারে সেদিন ওই মুখরা মেয়েটা সদর্পে বলেছিল, 'বাহবা'ও ছিল বৈ কি। ছিল রূপের 'বাহবা'।

কুঞ্জ ভাবতে পারত এ উমাশশী নয়, আর কেউ। ভাবতে পারত, উমাশশী মরে গেছে, এটা তার প্রেতাত্মা। কিন্তু কুঞ্জকে সেই 'ভাবনা'র শান্তিটুকুও দিল না ওই শয্যাবিলীনা নারী।

শক্তি নেই তবু মুখর হাসি হেসে বলে উঠল, 'ভেবেছিলাম জ্যান্ত থাকতে এই পোড়ামুখটা আর দেখাব না, একেবারে মরা মুখই দেখবে। হল না। দেখে ফেললে।'

'উমাশশী নয়', বলে আর স্বস্তি পাওয়া যায় না। কুঞ্জ মেজেয় পাতা বিছানার ধারে মাটিতে বসে পড়ে হাহাকারের গলায় বলে, 'এ কী?'

উমাশশী হাসে। ভারী বিকৃত দেখায় মুখটা। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'কোন্‌টা? বিছানায় পড়ে থাকা, না পোড়া মুখটা?'

'দুই! দুইই উমা। এ কী করে হল?'

উমা কষ্টে বলে, এত দেরিতে এলে, বলবার সময় আর কই? তা বলে ভেবো না, না খেতে পেয়ে মরছি। সে অহঙ্কার তুমি করতে পারতে না। এখনও অনেক টাকা আছে। গয়লা-বৌ আমার অনেক করছে, বলেছি তাকেই দিয়ে যাব।...চিঠিটা? ছলনা। দুষ্টুমি! তোমার টনক নড়াবার চেষ্টা। অসুখই। জ্বর রক্ত অতিসার। একেবারে শেষ করে ফেলল।'

কুঞ্জ আর্ত চিৎকার করে, 'ডাক্তার দেখেনি? ওষুধ পড়েনি?'

'পড়েছিল।' আবার হাসে উমা, 'গয়লা-বৌয়ের টোটকা। তার পর থেকেই চরমে উঠল আর কি।'

'তোমার চিঠি আমি পাইনি উমা—' কুঞ্জ হাহাকার করে ওঠে, 'বাইরে বাইরে ঘুরছিলাম। এক 'কাল' পালা নিয়ে—'

'পাওনি বুঝেছিলাম।'

কুঞ্জ হাউ হাউ করে কেঁদে বলে, 'বুঝেছিলে? এখনও এত বিশ্বাস করেছিলে আমার ওপর?'

'কি যে বল!'

উমা আরও আস্তে বলে, 'যেদিন বেলেঘাটার বস্তিতে এসে দাঁড়ালে সেই দিনই—না তারও আগে বোধ হয়। নইলে চিঠি দিয়ে ডাকতে পেরেছিলাম কি করে?...আর এখনও তা পারলাম কি করে?'

'উমা, আমি যাই! ডাক্তার ডেকে আনি—'

'আঃ, থামো! পোড়া মুখটা যখন দেখেই ফেললে, তখন তোমার মুখটা দেখতে দাও দু'দণ্ড।'

'আমার মুখটাও পোড়া, উমা! অহঙ্কার করে বলে গিয়েছিলাম তোমার মেয়েকে তোমার কাছে দিয়ে যাব! অহঙ্কার রইল না। ফিরে গিয়ে দেখলাম সেই ঘাগরা পরা মেয়েটা—' কুঞ্জ একটু থেমে বলে, 'দলের একটা ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে! এ্যাঁ! পালিয়েছে!' উমা হঠাৎ ভাঙা গলায় উচ্চ হাসি হেসে বলে ওঠে, 'বাঃ বাঃ। মায়ের উপযুক্ত মেয়ে হয়েছে তাহলে! দেখলে রক্তের গুণ? দূর দূরান্তরে রেখে একবারও চোখে না দেখিয়ে, তবু কেমন গুণটি ফলালাম?'

'আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি—' কুঞ্জ কোঁচার খুঁট তুলে চোখ মোছে, 'কত ভালো পাত্তর ঠিক করেছিলাম তার জন্যে।'

'স্বপ্নেও ধারণা করনি? কেন গো? ওর মা-বাপের পরিচয়টা বুঝি ভুলে গিয়েছিলে?'

কুঞ্জ উত্তর খুঁজে না পেয়ে বারে বারে চোখটা মুছে নিয়ে বলে, 'মুখের এ অবস্থা হল কি করে?'

'ওমা, এখনও তুমি মুখের কথা ভাবছ? ভাবলাম ভুলে গেলে! কিছু না। আমার সেই ভালোবাসার লোকের ভালোবাসার চিহ্ন। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলার পুরস্কার। বিছানায় শুয়েই মুখে অ্যাসিড্ ছুঁড়ে—'

'অ্যাসিড্!'

'হ্যাঁ, শুনলাম আমাকে শিক্ষা দিতে হাতের কাছে রাখা ছিল। বস্তির কাকে দিয়ে আনিয়ে—'

'থাক্ উমা, কথা বোলো না, কষ্ট হচ্ছে। আমি ডাক্তার আনি।'

'আনো তবে। তোমার আবার আক্ষেপ থেকে যাবে বিনি চিকিচ্ছেয় ম'লো—'

না, আক্ষেপ থাকেনি কুঞ্জর। করেছিল চিকিৎসা। কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিল। তার নির্দেশে কলকাতায় এনে ভালো হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। কিন্তু বাঁচল না উমাশশী। তবে কুঞ্জ তার প্রতিশ্রুতিও রাখল।

সেই আধপোড়া মুখটার মুখাগ্নি করল। করল শ্রাদ্ধ শান্তি। আর মোটা-বুদ্ধি গ্রাম্য লোকেরা যা করে তাই করল, সেই উপলক্ষে লোকজনও খাওয়াল বিস্তর।

কর্তার পরিবার ছিল এখনও, এই দেখে তাজ্জব হয়ে গেল সবাই। আর কর্তার সেই হঠাৎ চলে যাওয়াটার হদিশও পেল। ছিল গিন্নি রুগ্নটুগ্ন।

সব মিটে গেলে জীবনযুদ্ধে পরাজিতের চেহারা নিয়ে কুঞ্জ লিলিবালার অনেক খোঁজ করল, কিন্তু এই শহর কলকাতার রাক্ষসী ক্ষুধার জঠরে কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে এক ফোঁটা লিলিবালা, কে কার পাত্তা দেবে? নিমাই নামের যে অপদার্থ ছেলেটাকে ভর করে অবোধ দুঃসাহসী লিলিবালা ওই রাক্ষসীর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছিল, সে ছেলেটা হয়তো পালিয়েছে প্রাণ বাঁচিয়ে।

আর লিলিবালা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় পথ ভুল করে ধীরে ধীরে নেমে গেছে মৃত্যুর অন্ধকারে।

তবু সাহস করে 'ভবানী অপেরা' পার্টির দরজায় এসে দাঁড়াতে পারেনি। যেখানে জীবন ছিল, আশ্বাস ছিল, আশ্রয় ছিল।

কোথায় কি থাকে সেটা টের পায় না বলেই না মানুষের এত ভুল পথে ঘুরে মরা!

জ্বলন্ত নাটক নিয়ে রাজবাড়ির যাত্রা প্রতিযোগিতায় আর যোগ দেওয়া হল না কুঞ্জর, কবে যেন হয়ে গেছে সে সব। বায়না করাতে এসেও ফিরে যাচ্ছে লোকে, প্রোপ্রাইটারকে পাচ্ছে না।

প্রোপ্রাইটার তখন লিলিবালার মৃত্যু সংবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওটা পেলেই যেন বাঁচে সে। নিশ্চিন্ত হয়ে কাজকর্ম করতে পারে।

সেই বাঁচাটা হল না কুঞ্জর। সে খবরটা না পেয়েই ফিরে এল একদিন কাটোয়ায়। দলের অবস্থা তখন শোচনীয়। কেউ কেউ ছেড়ে গিয়ে অন্য কাজে যোগ দিয়েছে। মাইনে পাচ্ছিল না ঠিকমতো, করবে কি? আর যারা কুঞ্জর নিতান্ত পুষ্যি, তারা পড়ে আছে আর অধিকারীকে দু'বেলা গাল পাড়ছে। কারণ খাওয়াদাওয়া খারাপ হচ্ছে।

বাসমতী আর নববালা স্টেশনের ধারে পানের দোকান দিয়েছে। পানের সঙ্গে না কি পানীয়ও রাখছে তফাতে, অতএব তাদের জন্যে ভাবনা নেই। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কুঞ্জ আসতেই ব্রজ বিপিন জগবন্ধু ছেঁকে ধরল, 'ভবানী অপেরা' কি উঠে যাবে?'

কুঞ্জ তক্ষুনি রোদ্দুরে তেতে পুড়ে এসেছে, তবু সমীহ করল না। যে মনিব অধস্তন সম্পর্কে উদাসীন, তাকে কে সমীহ করে? রোদ্দুরে তেতে পুড়ে এসেছে কুঞ্জ, তবু তেতে উঠল না। শান্ত গলায় বলল, 'বোস বোস, বল দিকি তোরা কি চাস?'

'আমরা?'

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ওদের ভূমিকা এখানে কি!

কুঞ্জ বলল, 'বল? বল কী চাস? থাকবে, না উঠে যাবে?'

ওরা একত্রে বলে উঠল, 'থাকবে, থাকবে।'

থাকবে না তো তারা কোথায় যাবে?

'বেশ, তবে থাকবে।...'ভবানী অপেরা' থাকবে, তোরা থাকবি। নতুন করে জাঁকিয়ে তুলি আর একবার, অনেকদিন অবহেলা করা হয়ে গেছে।'

বরুণ এ দলে নেই, বরুণের কাছে যেতে হয়। 'লেখক, কি লিখলে এর মধ্যে?'

'কিচ্ছু না।'

'সে কি হে? এতদিন সময় পেলে?'

'মন লাগেনি। আর ভালো লাগছে না। আমায় এবার আপনি ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দেব? তোমায়?' কুঞ্জ হেসে ওঠে, 'তোমায় ছাড়ব তো থাকবে কি আমার?'

'সবই থাকবে।' বরুণ নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'চলেই যেতাম! নেহাত আপনার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারা গেল না তাই—'

'দেখা করলেই পারা যাবে কেমন?'

কুঞ্জ বলে, 'এই তো হল দেখা, কই যাও?'

বরুণ হেসে ফেলে বলে, 'আপনি অনুমতি করলেই যেতে পারি।'

'ও', অনুমতির অপেক্ষা? অনুমতি না দিলে তো যাওয়া বন্ধ? ঠিক আছে, দিলাম না অনুমতি, এবার কি করবে কর?'

'করবার আর থাকছে না কিছু। কিন্তু বাস্তবিকই আমাকে আর আটকাবেন না। রাস্তার লোক আবার রাস্তাতেই ফিরে যাই।'

'হবে না নাট্যকার, ওসব হবে না।' কুঞ্জ আগের মতো উদাত্ত গলায় বলে, 'ভবানী অপেরা' পার্টিকে আবার নতুন করে জাঁকিয়ে তুলতে হবে। সম্বল সহায়হীন হয়ে পারব কি করে?'

বরুণ নির্নিমেষ চোখে একবার ওই অতি উৎসাহী মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'আর পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

কুঞ্জ ঈষৎ মলিন হয়ে যায়। বলে, 'পারব না বলছ?'

'বলছি না। মনে হচ্ছে, সেটাই বলছি।'

'কিন্তু আমি বলছি বরুণ, পারব! কেউ পাশে থাকলেই সব পারা যায়। একটা ভালোবাসার লোক কাছে আছে, এটুকু জানতে পারলেই মনে বল আসে ভাই।...হ্যাঁ, ভাই-ই বলব এবার থেকে।' কুঞ্জ একটু হাসে, 'বরাবর ইচ্ছে হত, মুখে এসে পড়ত, কিন্তু সামলে নিতাম। কেন জানো?'

বরুণ অবাক হয়ে তাকায়।

এই নির্দোষ সম্বোধনটা মুখে এসে পড়লেও সামলে নেবার কারণ আবিষ্কার করতে পারে না সে।

কুঞ্জ আর একটু হাসে, 'জামাই করব বলে।...বুঝলে? রেলগাড়িতে দেখে পর্যন্তই ওই বাসনা। দেখ মুখ্যুমি? মাথা নেই মাথা ব্যথা! মেয়ে নেই জামাই!...বল, লিলি কি আমার মেয়ে? অথচ তাকে 'মেয়ে' সাজিয়ে জামাই ঠিক করতে বসলাম! মুখ্যুমির ফল ফলল তো? ওর বাপ আমার মুখে জুতো মেরে গেল।'...

কুঞ্জ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'তবে আক্ষেপটা রয়ে গেল এই, মেয়েটা আমায় মায়ামমতাহীন নিষ্ঠুর ভেবে গেল। মানে ভেতরটা তো ধরতে দিতাম না। ভাবতাম কে কখন সন্দেহ করে বসবে। হয়তো খুঁজে বার করতে চেষ্টা করবে কার গর্ভের মেয়ে।'

বরুণ ওই বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, 'সনাতন কোনো খবর করতে পারল না?'

'নাঃ! যে হারিয়ে যায়, সে নিজে না ধরা দিলে কার সাধ্য খুঁজে পায় রে ভাই! ভেবেছিলাম কষ্টে পড়লে ভুল বুঝবে। এসে দাঁড়াবে।...কিন্তু এখন বুঝছি ভুল ভেবেছিলাম, দাঁড়াবে কেন? শুধু তো সে তার বাপেরই মেয়ে নয়, মায়েরও মেয়ে যে! আমার মধ্যে কি আছে না আছে টের তো পায়নি, আসবে কি জন্যে?'

বরুণ বলে, 'ও নিয়ে আর মন খারাপ করবেন না, মিস্টার দাস! ধরে নিন—সে যেখানে আছে ভালো আছে, সুখে আছে।'

'তাই, তাই ভাবছি ভাই এখন। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর মরণ খবরটা পেয়ে একেবারে নিশ্চিন্দি হয়ে বসি। হল না। তবে ওটাই ভাবব, ভালো আছে সুখে আছে..তবে আর তোমার অপেরা পার্টি জাঁকিয়ে তুলতে বাধা কি ভাই?'

বরুণের হাতটা চেপে ধরে অধিকারী কুঞ্জ দাস।

বরুণ সে হাত ছাড়িয়ে নেয় না।

নরম গলায় বলে, 'না, বাধা আর কি। তুলুন জাঁকিয়ে।'

কুঞ্জ দাস সেই ধরা হাতটায় একটা নিবিড় চাপ দিয়ে বলে, 'তা হলে এবার আর ছাড়ছি না ভায়া, এবার একটা রোমান্টিক কাহিনি লিখতেই হবে।...আর 'চাবুক' নয়, 'দুঃশাসন' নয়, 'মহাকালের খাতা' নয়, শুধু ভালোবাসার কথা। স্নেহ প্রেম মায়া মমতা ভালোবাসা।...মহাকালের খাতায় কার কি জমা খরচ লেখা হচ্ছে, আমরা কি তার হিসেব রাখতে যাবার অধিকারী? তবু শুধু শুধু বড়াই কেন? ও খাতায় হাত দেবার আস্পর্ধা করতে গেলে কোন্ ফাঁকে নিজের জমার ঘরেই শূন্যি বসে যাবে কিনা কে জানে।'

—ঃ ঃ—